POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

এবং যদি শয়তানের পক্ষ হইতে কোন প্ররোচনা তোমাকে আক্রমণ করে তাহা হইলে তুমি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় ভিক্ষা কর,নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা,সর্বজ্ঞানী।

(আল আরাফ: ২০১)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 9

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 33

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 15 Aug, 2024 9 সফর 1445 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসা সৃষ্টি কর আর পশুসুলভ আচরণ ও মতবিরোধ পরিহার কর। সকল প্রকার হাসি-বিদ্রুপ থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাক, হাসি-ঠাট্টা মানুষকে হৃদয় থেকে সত্যকে অনেক দূরে সরিয়ে দেয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাণী

প্রকৃত বিষয় হল খোদা যা চান তা করেন। তিনি জনমানবশূন্য স্থানকে বসতিপূর্ণ স্থানে এবং সমৃদ্ধ বসতিকে জনমানবহীন বানিয়ে দিতে পারেন। বাবুল নগরীর কি পরিণতি হয়েছিল? যেখানে মানুষ বসতি স্থাপনের পরিকল্পনা করেছিল, সেই স্থান পরিত্যক্ত ও জনমানবহীন হয়ে পড়ল, পেঁচার আড্ডায় পরিণত হল। অপরদিকে এমন স্থানও ছিল যেখানে মানুষ ধু-ধু প্রান্তর ছাড়া কিছু দেখতে চাইত না, সেই স্থানটিকেই আল্লাহ্ তা'লা এমন এক স্থানে পরিণত করলেন, যেখানে সারা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষ একত্রিত হল। অতএব খুব ভাল করে স্মরণ রেখো যে, খোদা তা'লাকে দূরে সরিয়ে রেখে কেবল ওষুধ এবং মানবীয় পরিকল্পনার উপর ভরসা করা ঘোর নির্বুদ্ধিতা। চায় এমন এক জীবন যা সম্পূর্ণ নতুন, যেখানে প্রচুর ইসতেগফার পাঠ করা হয়। যারা জাগতিকতায় খুব বেশি নিমজ্জিত, তাদের বেশি ভয় পাওয়া উচিত। চাকুরীজীবীরা প্রায়শই ফরয বা আবশ্যকীয় কর্ম পালন করতে ব্যর্থ হয়। অনেক সময় যোহর ও আসর এবং মগরিব ও এশা জমা করা সঙ্গত। আমি জানি, কর্মকর্তাকে নামাযের জন্য বলা হলে তারা অনুমতি দিয়ে দেন। আর উর্ধ্বতন কর্তার অধীনে অফিসারদেরকে নির্দেশ দেওয়া থাকে। নামায এড়িয়ে যাওয়ার জন্য এমন খোঁড়া অজুহাত দেখানো নিজের দুর্বলতা প্রদর্শন ছাড়া আর কিছুই নয়। 'হুকুকুল্লাহ্ এবং হুকুকুল ইবাদ' পালনে ব্যর্থ হয়ো না।

এই সময় অত্যন্ত সংবেদনশীল। প্রত্যেক ব্যক্তির আল্লাহ্‌র শাস্তিকে ভয় পাওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় পুণ্যবান বান্দা ছাড়া আর কারো পরোয়া করেন না। পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসা সৃষ্টি কর আর পশুসুলভ আচরণ ও মতবিরোধ পরিহার কর। সকল প্রকার হাসি-বিদ্রুপ থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাক, হাসি-ঠাট্টা মানুষকে হৃদয় থেকে সত্যকে অনেক দূরে সরিয়ে দেয়। পরস্পরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর। প্রত্যেক ব্যক্তি যেন নিজ সুখ-স্বাচ্ছন্দের উপর নিজ ভাইয়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দকে প্রাধান্য দেয়। আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে বিবাদ পরিহার কর এবং তাঁর আনুগত্যে ফিরে এস। আল্লাহ্ তা'লার শাস্তি পৃথিবীতে নেমে আসছে আর তার থেকে তারাই রক্ষা পাবে, যারা সম্পূর্ণভাবে নিজেদের সমস্ত পাপ থেকে তওবা করে তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়। (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৪১-২৪৩)

কাফেররা আশ্চর্যান্বিত ছিল যে, তাদের মধ্য থেকে একব্যক্তির উপর কিভাবে ওহী হল? একই অবস্থা বর্তমান যুগের অনেক মুসলমানদের। তারাও একথা বলে যে, হযরত ঈসা (আ.) আকাশ থেকে নেমে এসে আমাদেরকে লাঞ্ছনা এবং পশ্চাদপদতা থেকে বের করবেন-আমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তির জন্ম হতে পারে না যে আমাদের চিকিৎসা করবে।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা ইউনুসের ৪ নং আয়াত- أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন- কাফেররাআশ্চর্যান্বিত ছিল যে, তাদের মধ্য থেকে একব্যক্তির উপর কিভাবে ওহী হল! অধঃপতিত জাতির মধ্যে এই চেতনা কাজ করে যে তাদের মধ্যে কোনও বড় সত্তা সৃষ্টি হতে পারে না। অর্থাৎ কাফেররা নিজেদের বিষয়ে এতটাই আশাহত হয়ে পড়েছিল যে, তাদের চিকিৎসা যে তাদের মধ্যেই বিদ্যমান সেকথা তারা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। তাদের ধারণা ছিল, তাদের উন্নতি এবং সমৃদ্ধির এবং চিকিৎসার জন্য বাইরে থেকে কারো আসা উচিত। একই অবস্থা বর্তমান যুগের অনেক মুসলমানদের। তারাও একথা বলে যে, হযরত ঈসা (আ.) আকাশ থেকে নেমে এসে আমাদেরকে লাঞ্ছণা এবং পশ্চাদপদতা থেকে বের করবেন- আমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তির জন্ম হতে পারে না যে আমাদের চিকিৎসা করবে। এবিষয়টিতে পূর্ববর্তী জাতিগুলির সঙ্গে তাদের কিরূপ সামঞ্জস্য রয়েছে - সেই একই নিরাশা আর একই চিকিৎসার উপায়!

যারা জাতির উন্নতির জন্য হয় কোন উৎসাহ রাখতেন না, কিম্বা মনে করতেন, বাহ্যিক চিকিৎসা ছাড়া কিছুই হতে পারে না, যখন তাদের মধ্য থেকেই তাদের ভাই দাবি করল, 'আমি তোমাদের চিকিৎসা করব আর তোমাদেরকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাব, তখন তাদের বিস্ময়ের অবধি ছিল না। তারা আশ্চর্যচকিত ছিল যে, যে বিষয় সম্ভব ছিল না তা সম্ভব করার দাবি এ কিভাবে করল?

দ্বিতীয় যে বিষয়টি তাদের জন্য আশ্চর্যের ছিল তা হল, এই দাবিদার

(এরপর শেষের পাতায়.....)

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

সফরকালে বিলম্বে নামায জমা করা

১০৯১) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত: আমি রসুলুল্লাহ্ (সা.) কে দেখেছি, যখন সফরে তিনি শীঘ্রই যাওয়ার পরিকল্পনা করতেন, তখন তিনি মগরিব ও এশার নামাযে দেরি করতেন এবং উভয় নামাযকে একত্রে পড়তেন। সালিম বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ (বিন উমর) ও এমনটাই করতেন, যখন তারা শীঘ্র সফরে যাওয়ার পরিকল্পনা করতেন।

আঁ হযরত (সা.) ফরজ নামাযের জন্য বাহন থেকে নেমে যেতেন।

১০৯৭) হযরত আমির বিন রাবিয়া থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রসুলুল্লাহ্ (সা.)কে দেখেছেন, উটের উপর নফল নামায পড়তে। তিনি (রুকু ও সিজদা) মাথার ইঙ্গিতে করছিলেন। তাঁর অভিমুখ সেদিকেই ছিল যেদিকে উট হেঁটে চলেছিল। রসুলুল্লাহ (সা.) ফরজ নামাযের ক্ষেত্রে এমনটা করতেন না।

মানুষ অধিকাংশ বিষয়ে ঝগড়া করে।

১১২৭) হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেছেন যে রসুলুল্লাহ্ (সা.) এক রাতে তাঁর এবং রসুল তনয়া হযরত ফাতিমা (রা.) এর কাছে এসে বলেন- 'তোমরা কি (তাহাজ্জুদের) নামায পড় না?' আমি বললাম, 'হে রসুলুল্লাহ! আমাদের প্রাণ আল্লাহ্ তা'লার হাতে আছে; তিনি যেদিন ইচ্ছে করেন আমাদেরকে ঘুম থেকে তুলে দেন। আমি একথা বললে তিনি ফিরে গেলেন, কোন উত্তর করলেন না। তিনি যখন ফিরে যাচ্ছিলেন, আমি তাঁকে দেখেছি নিজের উরু চাপড়াচ্ছিলেন আর বলছিলেন- 'মানুষ অধিকাংশ বিষয়ে ঝগড়া করে।'

(বুখারী, ৪র্থ খণ্ড)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

মৌলিক ধর্মতত্ত্ব ও এর খুঁটিনাটি

পুরুষরা নিজেরাই ইকামত বলবে আর এমনিতেও ইকামত সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রয়োজনে ইমাম নিজেও ইকামত বলতে পারে। বাড়িতে নামায হলেও মেয়েরা ইকামত বলবে না। কেননা হুযুর (সা.)-এর অনুমতি প্রদান করেন নি।

সত্যতায় কোন ধর্মের একচেটিয়া অধিকার নেই

ইসলামের বৈশিষ্ট-সূচক চেহারার বিষয়ে কথা বলার ক্ষেত্রে প্রথম এবং সবচেয়ে আকর্ষণীয় যে দিকটি কাউকে বিমুগ্ধ করে,সেটা হচ্ছে এর সেই অতি-সোহাগী দাবী ত্যাগ করা যে, সত্যতা কেবল ইসলামেই বিদ্যমান এবং আর কোন সত্য ধর্ম নেই।

একজন নাসেরা প্রশ্ন করে, জামাতের বইপুস্তক দৃষ্টিশক্তিহীনদের জন্য ব্রেইল অক্ষরে প্রকাশিত হবে?

হুযুর আনোয়ার বলেন, ইনশাআল্লাহ্! সেই সময় আসবে। যেভাবে জামাত আহমদীয়া উন্নতি করছে, সেটাও হবে। ইনশাআল্লাহ। হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন যে, তুমি কি কুরআন করীম পড়তে জান?

নাসেরা উত্তর দেয়, কুরআন করীম সে পড়তে জানে। তাছাড়া সে মুখস্তও করছে। হুযুর আনোয়ার বলেন, মাশাআল্লাহ॥ একদিন হবে ইনশাআল্লাহ॥ এই মুহূর্তে তো পুরোপুরি ছেপেও আসে নি। ইনশাআল্লাহ্ চেষ্টা করব।

প্রশ্ন: মানুষ তার প্রত্যেকটি কাজ প্রজ্ঞাসহকারে করার জন্য কোথা থেকে সে প্রজ্ঞা শিখতে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রজ্ঞা কি জিনিস? প্রজ্ঞা হল বুদ্ধিমত্তা। নিজের বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ কর। জ্ঞানার্জন করলে বুদ্ধি বাড়ে। জ্ঞানার্জনও কর, এতে তোমার মধ্যে কোন বিষয়কে বোঝার জন্য বেশি যোগ্যতা সৃষ্টি হবে। আর যখন কোন বিষয় বোঝার জন্য বেশি যোগ্যতা সৃষ্টি হয়,তখন তার উত্তরও প্রজ্ঞা সহকারে দেওয়ার যোগ্যতা তৈরী হয়। তাই প্রজ্ঞা হল পরিবেশ অনুসারে বুদ্ধিমত্তাসহকারে কথা বলা। কেউ যদি তোমার সঙ্গে লড়াই শুরু করে, আর তুমি তাকে কঠোরতার সাথে উত্তর দাও আর সে অসন্তুষ্ট হয়ে যায়,তবে সেটা প্রজ্ঞা নয়। কিন্তু সেই কথাই যদি কোমল ভাষায় বলা হয়, স্নেহ-ভালবাসা সহকারে বলা হয় এবং তাকে আশ্বস্ত করা হয় তবে সেটাই প্রজ্ঞা। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে যে বিবেক-বুদ্ধি দান করেছেন, তার দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত যে, আমাকে এর উত্তর কিভাবে দিতে হবে। আর এটা তখনই সম্ভব হবে, যখন তোমাদের কাছে জ্ঞানও থাকবে। তুমি যদি জোর করে কাউকে বল যে, তুমি পর্দা করো না, আল্লাহ্ তা'লার আদেশ পালন কর না তাই আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে শাস্তি দান করবেন, জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন- তবে তোমার এমন কথা শুনে সে ক্ষিপ্ত হয়ে বলবে, তুমি আমাকে এমনভাবে বলার কে? আল্লাহ্ তা'লা আমার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবেন। আমার বিষয়টি আল্লাহর সঙ্গে।' আর এই একই কথা যদি কাউকে স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে বল যে, আমি এজন্য পর্দা করি যে এটা খোদা তা'লার আদেশ, আমি তো ধর্মীয় শিক্ষার অনুশাসন মেনে এমনটা করে থাকি, তবে এর দ্বারা কৌশলে তাকে বোঝানোও হবে আর কোন বাক-বিতন্ডাও হবে না। প্রজ্ঞার অর্থ হল বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে কোনও কিছুর উত্তর দেওয়া যার শুভ পরিণাম বের হতে পারে।। কিন্তু ভয় পেয়ে যাওয়া প্রজ্ঞার মধ্যে পড়ে না। কেউ যদি তোমাকে আহমদী বলে আর তুমি বল, নিজের আহমদী হওয়ার পরিচয়টা গোপন রাখাই প্রজ্ঞার দাবি ছিল, অন্যথায় লোকে বিদ্রুপ করত। তাই বলে দিলাম যে আমি আহমদী নই। তবে এমন কাপুরুষতা প্রজ্ঞা নয়। বরং বলা উচিত, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আঁ হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আগমণকারী যুগ ইমামকে মান্য করার তৌফিক লাভ করেছি। এটাই উত্তর হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রজ্ঞার অর্থ ভীতি নয়। বরং এর অর্থ হল বুদ্ধি দ্বারা এমন একটা উত্তর দেওয়া যার মন্দ পরিণাম না আসে। কিন্তু যেখানে ঈমানের প্রশ্ন আসে, সেখানে ঈমান গোপন করা, ভয় পেয়ে নিজের আহমদী পরিচয়কে গোপন করা, কিম্বা নামাযের সময় হলে নামায এড়িয়ে চলা- এগুলি প্রজ্ঞার পরিচয় নয়। যেখানে ধর্মের প্রসঙ্গ আসে, সেখানে আত্মাভিমান প্রদর্শন করা উচিত। যেখানে কোন কিছু করার আদেশ রয়েছে, কাউকে বোঝানোর নির্দেশ রয়েছে সেখানে কথা বলার সময় প্রজ্ঞার আশ্রয় নিতে হবে।

প্রশ্ন: মানুষ কিভাবে বিপদ ও কঠিন সময় থেকে মুক্তি পেতে পারে? যখন সে অনুভব করে যে, তার ঈমান হারিয়ে যাচ্ছে তখন সে হারনো ঈমান কিভাবে পুনরুদ্ধার করতে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন, যদি ঈমান নষ্ট হতে শুরু করে তবে এর অর্থ হল আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক ভাল নেই। ঈমান সুদৃঢ় করার জন্য আল্লাহ্ তা'লার উপর অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস আনয়ন করতে হবে। এজন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন, সর্বপ্রথম অদৃশ্যের উপর ঈমান থাকা আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লার সত্তা এবং তাঁর শক্তিমত্তার উপর বিশ্বাস থাকা দরকার, এরপর তিনি কোথায় আছেন তা সন্ধান কর। গতকালই খুতবায় আমি হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এর ঘটনা বর্ণনা করেছিলাম। তাঁর বয়স যখন এগারো বছর, তিনি চিন্তা করেন যে তিনি কেন আহমদী, কেন একজন মুসলমান এবং কেন আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। এরপর তিনি চিন্তা করতে শুরু করেন। এক রাতে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে শেখানোর সিদ্ধান্ত নেন, তাই আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি দেখেই তিনি জানতে পারেন যে, এই সব নক্ষত্র থেকে আরও দূরে আরও অনেক নক্ষত্র রয়েছে, গ্রহ-উপগ্রহ রয়েছে, ব্রহ্মাণ্ড ছাড়িয়ে আরও অগণিত ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, লক্ষ কোটি ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে যা সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণা নেই। বিজ্ঞানীরা বলেন, ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা তাদের কাছে অজানা। তারা স্বীকার করছেন যে, এই সংখ্যা অসীম। সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার শক্তিমত্তাও অসীম। যখন আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কে এই সত্য জানা যাবে, তখন এটাও জানা উচিত যে, আল্লাহ্ আমাদের সংশোধনের জন্য যে সকল নবীদের প্রেরণ করেন, তাঁরাও সত্য। আর এ যুগে আঁ হযরত (সা.)কেও তিনি প্রেরণ করেছেন। কুরআন করীমে অসংখ্য ভবিষ্যদ্বাণী আছে। মানুষ নামায পড়ে না, নিজেদের ঈমানের দৃঢ়তার জন্য আল্লাহ্র কাছে কেঁদে কেঁদে দোয়া করে না। এতে ঈমান তো নষ্ট হবেই। এছাড়া যদি কুরআন করীম না পড়ে, কুরআন করীমকে বুঝে না পড়ে, এর বিধিনিষেধগুলিকে অনুধাবন না করে, যা মানুষের ঈমানকে দৃঢ়তা দান করে থাকে তবে মানুষের ঈমান দুর্বল হওয়াই স্বাভাবিক। এছাড়া এযুগে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদের অসংখ্য বই-পুস্তক দিয়েছেন। সেগুলির মধ্যে সহজ ও বোধগম্য বিষয়গুলি যদি আমরা নিজেদের ঈমান দৃঢ় করার জন্য পাঠ করি তবে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে আর সেই সঙ্গে আমাদের ঈমানও দৃঢ়তা লাভ করবে। এই বিষয়গুলি পরিশ্রম দাবি করে। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে বলেন-,,,, অর্থাৎ যারা আমার পথে জিহাদ বা সংগ্রাম করে, তাদেরকে আমি সঠিক পথ প্রদর্শন করি। এখানে জিহাদের অর্থ হল ঈমান আনার জন্য চেষ্টা করতে হয়।আর চেষ্টা হল আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করা, নিজের জ্ঞান বৃদ্ধির চেষ্টা করা, এবং কুরআনে বর্ণিত বিধিনিষেগুলি অনুধাবন করার চেষ্টা করা। বারো বছর বয়সে এই চেষ্টা শুরু করে দেওয়া উচিত।

প্রশ্ন: আপনার সব থেকে প্রিয় নজম কোনটি যেটি আপনি অধিকাংশ সময় শুনে থাকেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন, সুন্দরভাবে পরিবেশিত প্রতিটি নযমই আমাকে ভাল লাগে। আর সব থেকে বেশি ভাললাগে হযররত মসীহ মওউদ (আ.)-এর নযমসূহ। কালামে মাহমুদের অনেক নযম রয়েছে, দুররে আদন এর নযম রয়েছে। এছাড়াও অনেক কবিদের নযম রয়েছে। কোনও দিন কোন জিনিষের মন চায় আর কখনও শোনার সুযোগ হয় তবেই। প্রায়ই বসে নযম শোনার সময় হয় না। তুমি কোন্ নযমটি শোন?

নাসেরা উত্তর দেয়, অনেক নযমই শুনি, যেমন-খলীফা কে হাম হ্যাঁ' , খলীফা দিল হামারা হ্যায়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, দুররে সমীনের নযম পড়বে আর কালামে মাহমুদের নযম পড়বে, এগুলি দ্বারা ঈমান বৃদ্ধি পাবে। সাময়িক আবেগ সৃষ্টির জন্য যুগ ইমাম হযরত মসীহ মওউদ(আ)এর বাণী ও খলীফাগণের বাণীও পাঠ করা উচিত। এর দ্বারা ঈমান উন্নতি লাভ করে।

প্রশ্ন: জাপান, কোরিয়া এবং চীনে সালাম করার সময় মানুষ ঝুঁকে পড়ে। আমরা সেই সব দেশে গেলে এভাবে ঝুঁকে পড়লে কি সেটাকে শিরক বলা হবে। কেননা, মানুষের

(এরপর ৭ ও শেষের পাতায়.....

জুমআর খুতবা

সালাম বিন মিশকাম বলল: খোদার কসম! তুমি জানো, আর তোমার সাথে আমরাও জানি যে, তিনি আল্লাহ্ তা'লার সত্য রসূল। তাঁর বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে আমরা অবগত। যদি আমরা তাঁর আনুগত্য না করি তবে এর একমাত্র কারণ হলো, আমরা তাঁর প্রতি হিংসাত্মক মনোভাব রাখি, কেননা নবুয়্যত বনু হারূন থেকে বিলুপ্ত হয়েছে। চলো, আমরা তাঁর প্রস্তাবিত নিরাপত্তা গ্রহণ করি।

সালাম বিন মিশকাম বলল, আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই'র কথায় কোনো বিশ্বাস নেই। সে তোমাকে ধ্বংসের গহ্বরে নিপতিত করতে চায়। এমন কি সে চায়, তুমি মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও। এক্ষেত্রে সে নিজের বাড়িতে বসে থাকবে আর তোমাকে পরিত্যাগ করবে।

আঁ হযরত (সা.) হযরত মহম্মদ বিন মুসলিমা (রা.) কে আদেশ দিলেন, বনু নযীর গোত্রের ইহুদীদের নিকট গিয়ে তাদের বল, আমাকে রসুলুল্লাহ্ (সা.) তোমাদের প্রতি এই বাতা সহ প্রেরণ করেছেন যে, তোমরা শহর ছেড়ে বেরিয়ে যাও।

হুয়ী তার ভাই জুদাই বিন আখতাবকে দূত হিসেবে প্রেরণ করে বললেন, যাও মুসলমান সেনাপতিকে গিয়ে বলে দাও, আমরা এখান থেকে যাব না, তোমরা যা খুশি করতে পার। আঁ হযরত (সা.) বললেন, 'হারাবাতিল ইয়াহুদ' অর্থাৎ ইহুদীরা যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছে।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ৫ জুলাই, ২০২৪, এর জুমুআর খুতবা (৫ ওফা, ১৪০৩ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজ দুটি যুদ্ধের উল্লেখ করব। প্রথম যুদ্ধের নাম হলো বদরুল মওয়েদ এর যুদ্ধ, যা চতুর্থ হিজরী সনে সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ বদরুল মওয়েদ, বদরুস্ সানীয়া, বদরুল আখেরা এবং বদরুস্ সুগরা নামেও প্রসিদ্ধ।

(আর রাহীকুল মাখতুম, পৃ: ৩১২, ৩১৩)

এই যুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। ইবনে হিশাম এবং ইবনে ইসহাক-এর মতে মহানবী (সা.) চতুর্থ হিজরী সনের শাবান মাসে বদরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

(আসসীরাতুন নবুবিয়া লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৬১৮)

ওয়াকদী-র মতে এই যুদ্ধ চতুর্থ হিজরী সনের যিলকদ মাসের চাঁদ দেখা যাবার পর হয়েছে। আর বদরে যিলকদ মাসের এক থেকে আট তারিখ পর্যন্ত হাট বসতো। (কিতাবুল মাগাযি ওয়াকিদি, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩২৪-৩২৫)

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (সা.) শাওয়াল মাসে বদরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। অর্থাৎ মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে মহানবী (সা.) যিলকদ মাসের চাঁদ দেখা যাওয়ার রাতে বদরের ময়দানে পৌঁছেন। যাহোক, উক্ত তিনটি বর্ণনা অনুযায়ীই এই যুদ্ধ চতুর্থ হিজরী সনে হয়েছে।

(সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৭৩-৩৭৪)

যদিও মাসের ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবও এ প্রেক্ষিতে লিখেছেন যে, চতুর্থ হিজরী সনে শাওয়াল মাসের শেষের দিকে মহানবী (সা.) দেড় হাজার সাহাবীর একটি দলকে সাথে নিয়ে মদীনা থেকে বের হন। " (সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ: ৫২৯)

এই যুদ্ধের কারণ হলো, আবু সুফিয়ান বিন হারব উহুদের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার সময় উচ্চৈঃস্বরে বলেছিল যে, আগামী বছর আমাদের এবং তোমাদের সাক্ষাৎ বদরুস্ সুফরা নামক স্থানে হবে। বদরকে বদরুস্ সুফরা-ও বলা হয়। আমরা সেখানে যুদ্ধ করব। মহানবী (সা.) হযরত উমরকে বলেন যে, হ্যাঁ, তাকে বলো, ইনশাআল্লাহ্। আল্লামা বায়যাভী লিখেছেন যে, মহানবী (সা.) স্বয়ং উত্তর দিয়েছিলেন, ইনশাআল্লাহ্। বদর, মক্কা এবং মদীনার মাঝখানে একটি প্রসিদ্ধ কূপ, যা সাফরা এবং জার উপত্যকার মাঝে অবস্থিত। বদর মদীনার দক্ষিণ পশ্চিমে ১৫০ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থি ত। এটি হলো এই জায়গার অবস্থান। অজ্ঞতার যুগে এখানে প্রতি বছর যিলকদ মাসের এক তারিখ থেকে আট দিন পর্যন্ত একটি বড়ো মেলা বসতো। যদিও আবু সুফিয়ান অহংকারবশত এই ঘোষণা করে দিয়েছিল, কিন্তু এখন যতই প্রতিশ্রুত সময় নিকটবর্তী হচ্ছিল আবু সুফিয়ান মোকাবিলাকে পাশ কাটিয়ে যেতে চাচ্ছিল। কিন্তু এমন ভাব করছিল যে, সে অনেক বড়ো এক বাহিনী নিয়ে তাঁর (সা.) ওপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করছে, যেন এই সংবাদ মদীনাবাসীদের কাছে পৌঁছে যায় আর আরবের অন্যান্য অংশেও ছড়িয়ে পড়ে আর মুসলমানদের এর মাধ্যমে ভয় দেখানো যায়। এরই মাঝে বনু আশজা'আ গোত্রের সদস্য এক ব্যক্তি নুয়াইম বিন মাসঊদ মক্কায় যায়। সে পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। সে সেখানে আবু সুফিয়ানের সাথে সাক্ষাৎ করে আরবলে, আমি মক্কায় এই উদ্দেশ্যে এসেছি যেন তোমাকে মুসলমানদের প্রস্তুতি সম্পর্কে অবগত করতে পারি। আমি নিজে দেখেছি যে, তাদের কাছে অগণিত অস্ত্র, উট এবং ঘোড়া রয়েছে। আর তারা তাদের মিত্র গোত্রকেও সাথে নিয়েছে। এখন তারা একান্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে আক্রমণ করতে যাচ্ছে। দেখো! তুমি নিজে মোকাবিলার জন্য আহ্বান করেছিলে, এখন উক্ত প্রতিশ্রুতির সময় নিকটে চলে এসেছে, অতএব তোমরা এখন যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেদের নৈপুণ্য প্রদর্শন করো। আবু সুফিয়ান কথা এড়িয়ে বলে, হে নুয়াইম! তুমি জানো যে, আমাদের এলাকায় দুর্ভিক্ষ চলছে। দীর্ঘ সময় ধরে বৃষ্টি হয় নি, জলাধারগুলো শুকিয়ে আছে,চারণভূমিগুলোতে পশুপাল ও বাহনের পশুগুলোর জন্য ঘাসের খড়কুটা পর্যন্ত নেই। চতুর্দিকে খাদ্যাভাব রয়েছে। অতএব বুদ্ধিমানের কাজ হলো, আমরা এই দিনগুলো পার করে নেই। আর এর জন্য তুমি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারো। অর্থাৎ তার কাছে সাহায্য চায় যে, তুমি মদীনায় গিয়ে মানুষের কাছে আমাদের সংকল্প ও জনবল সম্পর্কে বাড়িয়ে বাড়িয়েবলো এবং তা অনেক বেশি প্রচার করো, যেন আমাদের সম্মানও রক্ষা পায় আর মুসলমানরা নিজেরাই ভয়ে বদরের দিকে না আসে। নুয়াইম বলে, এর বিনিময়ে আমাকে কী দেবে? আবু সুফিয়ান বিশটি উট দেয়ার প্রস্তাব দেয়, যা নুয়াইম সানন্দে গ্রহণ করে নেয় আর বলে, এই পুরস্কার সুহায়েল বিন আমর-এর কাছে প্রদান করা হোক, তারপর আমি এই কাজের জন্য যাব। সুহায়েল তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। তার নিশ্চয়তা দেওয়ার ফলে নুয়াইম যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। তাকে দ্রুতগামী উট দেওয়া হয় যেন এই পরিকল্পনাকে দ্রুততম সময়ে বাস্তবায়ন করা যায়।

[দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) ৭ম খণ্ড,পৃ: ২৪০] (এটলাস সীরাত নববী, পৃ: ২১৬) (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড,প,ৃ: ৩৩৭) (গাযওয়াতুন নবী, পৃ: ২৫৯)

নুয়াইম যাত্রার প্রস্তুতি নেয় আর মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। সে উমরা করে মাথা মুণ্ডন করে রেখেছিল এবং মদীনার দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল। সে যত দ্রুত সম্ভব মদীনায় পৌঁছতে চাচ্ছিল যেন পাছে ইসলামী বাহিনী মদীনা থেকে বেরিয়ে না পড়ে। অতএব সে যখন মদীনায় পৌঁছে তখন মুসলমানরা একান্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে জিহাদের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিল। মুসলমানরা তাকে জিজ্ঞেস করে, নুয়াইম! কোথা থেকে এসেছো? সে বলে, আমি মক্কা থেকে উমরা করে এসেছি। তারা বলে, তাহলে তো আবু সুফিয়ান সম্পর্কে তোমার জানা থাকবে। তার যুদ্ধের প্রস্তুতি কেমন? সে বলে, আবু সুফিয়ান তো অনেক বড়োবাহিনী একত্রিত করে নিয়েছে। পুরো আরবকে নিজের সাথে যুক্ত করেছে। সে অনেক অত্যুক্তি করে বলে, সে এত বড়ো বাহিনী নিয়ে আসছে যে, এর মোকাবিলা করা তোমাদের জন্য সম্ভব নয়। আমার মতে তোমরা মদীনাতেই অবস্থান করো, যুদ্ধের জন্য মদীনা থেকে বাহিরে যেও না। সে এত বড়ো বাহিনীসহ আক্রমণ করতে যাচ্ছে যে, তার হাত থেকে কেবল সে-ই বাঁচতে পারবে যে পলায়ন করবে। তোমাদের নেতৃ স্থানীয়দের হত্যা করা হবে। স্বয়ং মুহাম্মদ (সা.) এত বেশি আঘাত সইতে পারবেন না। তোমরা কি মদীনা থেকে বেরিয়ে মৃত্যুর মুখে যেতে চাও? পরিতাপ যে, তোমরা নিজেদের জন্য অনেক মন্দ সিদ্ধান্ত নিয়েছো। খোদার কসম, আমি মনে করি না যে, তোমাদের কেউ

বাঁচতে পারবে। সে খুবই হতাশাব্যঞ্জক কথা বলে যেন তারা ভয় পেয়ে যায়। সে এমনভাবে কথার অতিশয়োক্তি করে যে, কখনো আবু সুফিয়ানের প্রস্তুতকৃত সৈন্যদের সংখ্যাধিক্যের উল্লেখ, কখনো তাদের অস্ত্রের ভাণ্ডারের বর্ণনা, কখনো কুরাইশ নেতৃবৃন্দের উৎসাহ উদ্দীপনার গল্প, কখনো তাদের ভয়ানক যুদ্ধকৌশলের প্রশংসা করতে থাকে। সে এত নৈপুণ্যের সাথে নিজ কার্য পরিচালনা করে যে, কয়েক দিনেই মদীনার পরিবেশ ভয় ও ভীতিতে বিষাক্ত হয়ে ওঠে।

নুয়াইম বিন মাসউদ-এর কৌশল কার্য করী প্রমাণিত হয়। দুর্বল ঈমানের মুসলমানরা তার গুজবসমূহের কারণে আসলেই ভয় পেয়ে যায়। এমনকি যে-ই কথা বলতো, সে নুয়াইম বিন মাসউদ-এর কথার সত্যায়ন করতো। প্রতিটি সভায় আবু সুফিয়ানের বিশাল বাহিনী ও ভয়াবহ প্রস্তুতির আলোচনা চলছিল। মুসলমানদের এই অবস্থা দেখে ইহুদী ও মুনাফিকদের আনন্দ বঁাধ মানছিল না। আর তারা একে অপরকে এই সুসংবাদ দিচ্ছিল যে, এখন ইসলামের অনুসারীদের অস্তিত্ব ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে যাবে।

(সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৯১)

মদীনার এই পরিস্থিতির সময়ে হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হন। তারা নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় ধর্মকে জয়যুক্ত করবেন, স্বীয় নবী (সা.)-কে সম্মান দেবেন। আমরা জাতির সাথে প্র তিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলাম আর আমরা এর বিরুদ্ধাচরণ পছন্দ করি না। তারা অর্থাৎ কাফিররা এটিকে কাপুরুষতা মনে করবে যদি আমরা সেখানে অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে না যাই। আপনি প্রতিশ্র ুতি অনুযায়ী সেখানে চলুন। খোদার কসম! এতে অবশ্যই কল্যাণ নিহিত। এরূপ আবেগপূর্ণ কথা শুনে তিনি (সা.) অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং বলেন, ***ওয়াল্লাযি নাফসী বেইয়াদিহি লাআখরুজান্না ওয়া ইন লাম ইয়াখরুজ মায়ীআ আহাদুন***। অর্থাৎ সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, যদি একজনও আমার সাথে বের না হয় তবুও আমি অবশ্যই বের হবো।

মুসলমানরা আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর দৃঢ়তা ও সাহস এবং উদ্যম দেখার পর তাদের ভয় ও ভীতি দূর হয়ে যায়। আর তারা উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে প্রস্তুতি নিতে থাকে।

[দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.), ৭ম খণ্ড,পৃ: ২৪১-২৪২]

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)ও এ যুদ্ধ সম্পর্কে অর্থাৎ গযওয়ায়ে বদরুলমওয়েদ সম্পর্কে লিখেছেন, উহুদের যুদ্ধে বিজয় লাভ এবং এত বিশাল সেনাবাহিনী থাকা সত্ত্বেও আবু সুফিয়ান বিন হারবের হৃদয় ভীতত্রস্ত ছিল আর ইসলামের ধ্বংসের বাসনা থাকা সত্ত্বেও সে চাইত, এক বিশাল দল প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত সে যেন মুসলমানদের মুখোমুখি না হয়। অতএব, মক্কায় থাকা অবস্থায়ই সে নুয়াইম নামক নিরপেক্ষ একটি গোত্রের সদস্যকে মদীনা অভিমুখে প্রেরণ করে এবং সে জোরালোভাবে বলে, মুসলমানদেরকে ভয়ভীতি দেখিয়ে বা সত্য-মিথ্যা গল্প বানিয়ে যেভাবেই হোক তাদেরকে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হওয়া থেকে বিরত রাখবে। অতঃপর এই ব্যক্তি মদীনায় আসে এবং কুরাইশের প্রস্তুতি, শক্তিমত্তা এবং তাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনার অলীক গল্প শুনিয়ে মদীনায় এক অস্থিতিশীল পরিস্থি তি সৃষ্টি করে। এমনকি কতিপয় দুর্বল প্রকৃতির মানুষ এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে ভয় পেতে আরম্ভ করে। কিন্তু মহানবী (সা.) যখন (যুদ্ধাভিযানে) বের হওয়ার আহ্বান জানান এবং তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, আমরা কাফিরদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এ সময় বের হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, তাই আমরা এ থেকে পিছু হটতে পারি না আর আমাকে যদি একাও যেতে হয় তবু আমি যাব এবং শত্রুর মোকাবিলায় একাই দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হবো- (একথা শুনে) লোকজনের ভীতি দূর হতে থাকে আর গভীর উদ্দীপনা ও নিষ্ঠার সাথে তাঁর সাথে যাত্রা করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। " (সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৫২৯)

(অর্থাৎ) পুনরায় প্রস্তুতি আরম্ভ হয়ে যায়। যাইহোক, আবু সুফিয়ানের সেনাদলের প্রস্তুতি সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর মহানবী (সা.) মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই-এর নিষ্ঠাবান ও নিবেদিতপ্রাণ এবং খাঁটি মুসলমান পুত্র আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল্ল াহ্ বিন উবাই বিন সলূল (রা.)-কে নিজের অবর্ত মানে মদীনার আমীর নিযুক্ত করেন। আরেকটি রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)-কে আমীর নিযুক্ত করেন। যাহোক, হতে পারে ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য দুজনকেই ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করে থাকবেন অথবা এটিও হতে পারে যে, আব্দুল্লাহ্ নাম শুনে বর্ণনাকারীরা সংশয়ে পড়েছেন। কেউ আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ বলেছেন আর কেউ বা আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহার (নাম) উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি (সা.) তাঁর পতাকা হযরত আলী (রা.)-কে প্রদান করেন এবং পনেরশ সাহাবীকে সাথে নিয়ে বদর অভিমুখে যাত্রা করেন। এই সেনাদলে দশজন অশ্বারোহী ছিলেন। একটি ঘোড়া মহানবী (সা.)-এর জন্য (নির্ধারিত) ছিল। এছাড়া হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত আবু কাতাদা, হযরত সাঈদ বিন যায়েদ, হযরত মিকদাদ বিন আসওয়াদ, হযরত হুব্বাব বিন মুনযের, হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম, হযরত আব্বাদ বিন বিশর (রা.)-এর কাছে ঘোড়া ছিল। মুসলমানরা তাদের বাণিজ্যিক পণ্যসামগ্রী সাথে নিয়ে বদরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। মুসলমানরা যখন বদরের প্রান্তরে পৌঁছেছিল তখন যিলকদের চাঁদ উদিত হয়। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হয়, মুসলমানরা আবু সুফিয়ানের সাথে যুদ্ধ করতে এবং তার মোকাবিলার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল, কিন্তু তাদের বাণিজ্যিক পণ্য এবং বিভিন্ন জিনিসপত্র সাথে নিয়ে যাওয়া (মূলত) তাদের দৃঢ়প্রত্যয়, সাহসিকতা এবং অটল বিশ্বাসের পরিচয় বহন করে আর এটিও অসম্ভব নয় যে, মহানবী (সা.)-এর নির্দে শনা বা ইঙ্গিতেই তারা নানাবিধ বাণিজ্যিক পণ্যসামগ্রী সাথে নিয়ে রওনা হয়েছে। অর্থাৎ (তাদের বিশ্বাস ছিল,) সম্ভবত আবু সুফিয়ান মোকাবিলা করতে আসবেই না আর এলেও চরমভাবে পরাজয় বরণ করে পালিয়ে যাবে এবং সেই দিনগুলিতে সেখানে যে মেলা বসতো মুসলমানরা তাতে ক্রয়বিক্রয়ের মাধ্যমে ব্যবসা করে লাভবান হবে, আর বাস্তবেও এমনটিই হয়।প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বদরের প্রান্তরে মহানবী (সা.) আবু সুফিয়ানের অপেক্ষায় অবস্থান করেছিলেন। এমন সময় মাগশী বিন আমর যামরী মহানবী (সা.)-এর নিকট আসে। সে বনু যামরা গোত্রের নেতা ছিল আর দ্বিতীয় হিজরীতে মুসলমানদের সাথে এই গোত্রের একটি চুক্তি হয়েছিল। অর্থাৎ তিনি (সা.) বনু যামরার ওপর আক্রমণ করবেন না আর বনু যামরাও তাঁর বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না আর অন্য কারও পদক্ষেপে অংশগ্রহণও করবে না, এছাড়া তাঁর কোনো শত্রুকে তারা সাহায্যও করবে না। সে বলে, হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি কি এ ঝরনায় কুরাইশের সাথে যুদ্ধ করতে এসেছেন? এই আলোচনা থেকে মহানবী (সা.) ধারণা করতে পারেন, এই ব্যক্তি কুরাইশের প্রতি অনুরক্ত। (তখন) তিনি (সা.) বলেন,হ্যাঁ, হে বনু যামরার ভাই! তুমি চাইলে আমাদের পরস্পরের মাঝে বিদ্যমান সন্ধিচুক্তি বাতিল করে আমরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে পারি যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের ও তোমাদের মাঝে আল্লাহ্ তা'লা সিদ্ধান্ত করে দেন। (একথা শুনে) মাগশী বলে, হে মুহাম্মদ (সা.),আল্লাহ্‌র শপথ! আপনাদের সাথে আমাদের যুদ্ধ করার কোনো প্রয়োজন নেই। (সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৭৪)

(এটলাস সীরাত নববী, পৃ: ২০২) [দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.),৭ম খণ্ড, পৃ: ২৪২-২৪৪) (আসসীরাতুন নববিয়াহ লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৬১৮)

এই সাক্ষাতে মহানবী (সা.) প্রজ্ঞা ও বীরত্বের সাথে এই গোত্রের সামনে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দেন যে, আমাদের মাঝে সন্ধিচুক্তি কোনো প্রকার কাপুরুষতা বা দুর্বলতার কারণে সম্পাদিত হয় নি। এছাড়া উহুদের যুদ্ধের পর মুসলমানদেরকে দুর্বল ভেবে বিভিন্ন গোত্র যে তাদের ওপর আক্রমণের ষড়যন্ত্র করছিল তাদের ওপর মহানবী (সা.) অত্যন্ত প্র জ্ঞা ও সফলতার সাথে মুসলমানদের শক্তি ও সাহসিকতার প্রভাব প্রতিপত্তি পুনর্বহাল করেন। (সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৯৭)

অঙ্গীকার অনুযায়ী মুসলমানরা বদরের প্রান্তরে পৌঁছে গেলেও আবু সুফিয়ান কুরাইশ নেতাদের বলে, আমি নুয়াইম বিন মাসউদকে পাঠিয়ে দিয়েছি; অভিযানে বের হবার পূর্বেই সে মুসলমানদের মনোবল ভেঙে দেবে। সে জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তবুও আমরা এক বা দুরাতের জন্য (মক্কা হতে) বের হবো আর এরপর আমরা ফিরে আসবো। মুহাম্মদ (সা.) অভিযানে বের না হলে আমরা নিশ্চিন্তে বলে দেব, আমরা তো গিয়েছিলাম কিন্তু মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সঙ্গীরা আসে নি, আর এভাবে আমাদের বিজয় অর্জিত হবে। তবে তারা যদি অভিযানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে আসে তাহলে আমরা এমন ভাব দেখাবো যে, এটি দুর্ভিক্ষের বছর, তাই আমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্যের বছরে (অভিযানে) বের হওয়া উপযুক্ত হবে। আর একথা বলে পথ থেকেই আমরা ফিরে আসবো। একথা শুনে কুরাইশরা বলে, এটি উত্তম পরামর্শ। কথা মতো আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে কাফিরদের সেনাবাহিনী মক্কা থেকে যাত্রা করে আর তাদের সংখ্যা ছিল দুহাজার। তাদের কাছে পঞ্চাশটি ঘোড়া ছিল। 'মার্‌রুয্ যাহরান'উপত্যকার 'মাযান্না' নামক ঝরনার কাছে এই সেনাদল শিবির স্থাপন করে। 'মার্‌রুয্ যাহরান' মক্কা থেকে ২২ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। দুর্ভিক্ষের দরুন কুরাইশের অর্থনৈতিক অবস্থা আসলেই খারাপ ছিল এবং তাদের আয়-উপার্জনের উৎস কমে গিয়েছিল। এ জন্য নির্ধারিত সময়ে এবং স্থানে, অর্থাৎ বদরের প্রান্তরে পৌঁছার সাহস তাদের হচ্ছিলো না। কিন্তু অপদস্ত হওয়ার ভয়ে এই সেনাদলটি যাত্রা করে। তাদের সেনাপতি মক্কা থেকেই ক্লান্ত শ্রান্ত ও হতাশ ছিল। সে মুসলমানদের সাথে আসন্ন যুদ্ধের পরিণাম সম্পর্কে বার বার ভাবছিল আর তাদের ভয়ে কাঁপছিল। 'মার্‌রুয্ যাহরান' পৌঁছার পর তার মনোবল ভেঙে যায় এবং

ফিরে যাবার জন্য সে অজুহাত খুঁজতে থাকে। অবশেষে সে তার সেনাদলের মাঝে ফিরে যাবার ঘোষণা দেওয়ার জন্য এবং এর বিভিন্ন কারণ ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হয়। সে বলে, হে কুরাইশের লোকেরা! যুদ্ধের উদ্দেশ্যে তোমাদের জন্য শস্যশ্যামল ও সমৃদ্ধির বছর উত্তম হবে,যাতে তোমরা পশুর পাল চরাতে পারবে এবং নিজেরাও দুধ পান করতে পারবে। বর্তমানে খরা চলছে। তাই আমি ফিরে যাচ্ছি, তোমরাও ফিরে চলো। আবু সুফিয়ানের এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা না করে সবাই ফিরতি পথ ধরে আর কেউই যাত্রা অব্যাহত রাখার বা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার মত ব্যক্ত করে নি। যা থেকে বুঝা যায়, গোটা সেনাদলের ওপরই মুসলমানদের ভীতি ছেয়ে ছিল। (সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৯৫-৯৬)

অঙ্গীকার অনুযায়ী আবু সুফিয়ানের অপেক্ষায় মহানবী (সা.) বদরের প্রান্তরে আট দিন অবস্থান করার পর মদীনায় ফিরে আসেন। এ যুদ্ধের জন্য তিনি (সা.) সর্বমোট ষোলো রাত মদীনার বাইরে থাকেন। শত্রুরা মোকাবিলা করার সাহসই পায় নি এবং তারা চরমভাবে লাঞ্ছিত হয়। মুসলমানদের মনোবল দৃঢ় হয়। এ অঞ্চলের কোনো কোনো স্থানীয় কাফির মক্কার কুরাইশের প্রতি অনুরক্ত ছিল। মহানবী (সা.) অত্যন্ত বীরত্বের সাথে তাদের কাছে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ও সংকল্প ব্যক্ত করলে তারাও সতর্ক হয়ে যায়। বদরের কোনো কোনো ব্যাবসায়ী বাণিজ্য শেষে মক্কায় ফিরে গিয়ে আবু সুফিয়ানকে মুসলমানদের সুদৃঢ় অবস্থানের কথা সবিস্তারে অবগত করে। ফলে আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গীরা তাদের কাপুরুষতা ও অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য খুবই লজ্জিত হয়। এই অভিযানে কার্যত কোনো যুদ্ধ না হলেও মুসলমানদের সম্মান ও আত্মবিশ্বাস পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং শত্রুর ওপর (তাদের) প্রতাপ অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়।

(কিতাবুল মাগাযি ওয়াকিদি, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩২৪) [দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) ৭ম খণ্ড, পৃ: ২৪৮]

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এ প্রসঙ্গে লেখেন, মহানবী (সা.) দেড় হাজার সাহাবীসহ মদীনা থেকে যাত্রা করেন আর অপর দিকে আবু সুফিয়ান তার দুই হাজার সৈন্যসহ মক্কা থেকে যাত্রা করে। কিন্তু ঐশী অভিপ্রায়ে যা ঘটে তা হলো, মুসলমানরা নিজেদের প্র তিশ্রু তি অনুযায়ী বদরে গিয়ে উপনীত হয় ঠিকই , কিন্তু কুরাইশ সেনাদল কিছুদূর এসে পুনরায় মক্কায় ফিরে যায়। আর এই ঘটনার বিবরণ অনেকটা এমন যে, আবু সুফিয়ান যখন নুয়াইমের ব্যর্থতার খবর পায় তখন সে মনে মনে ভয় পায় এবং নিজের সেনাদলকে এই উপদেশ দিয়ে পথ থেকে ফেরত নিয়ে যায় যে, এ বছর চরম দুর্ভিক্ষ আর মানুষ অভাবে আছে; তাই এ সময় যুদ্ধ করা ঠিক নয়। যখন স্বাচ্ছন্দ্য আসবে তখন অধিক প্রস্তুতি নিয়ে মদীনায় আক্রমণ করব। ইসলামী সেনাদল আট দিন পর্যন্ত বদর(প্রান্ত রে) অবস্থান করে আর সেখানে যেহেতু যিলকদ মাসের শুরুতে প্রতি বছর মেলা বসতো তাই সেই দিনগুলোতে অনেক সাহাবী সেই মেলায় ব্যবসা করে অনেক মুনাফা অর্জন করে। এমনকি তারা এই আট দিনের ব্যবসায় নিজেদের মূলধন দ্বিগুণ করতে সমর্থ হয়। মেলা শেষ হয়ে যাবার পরও যখন কুরাইশ সেনাদল আসলো না তখন মহানবী (সা.) বদর থেকে যাত্রা করে মদীনায় ফিরে আসেন আর কুরাইশরা মক্কায় পৌঁছে মদীনায় আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করে। " (সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৫২৯-৫৩০)

[কুরাইশরা (মক্কায়) ফেরত গিয়ে লজ্জা ঢাকার জন্য এবং মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে পুনরায় যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে। যাহোক, এই যুদ্ধের পরিণাম এমনই হয়।]

দ্বিতীয় যুদ্ধাভিযান হলো দূমাতুল জান্দালের যুদ্ধাভিযান। পঞ্চম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে এই যুদ্ধাভিযান সংঘটিত হয়। দূমাতুল জান্দাল মদীনা থেকে প্রায় চারশ পঞ্চাশ মাইল দূরে অবস্থিত। প্রাচীনকালে এই যাত্রা প্রায় পনের থেকে সতেরো দিনে সম্পন্ন হতো। এটি মদীনার উত্তরে সিরিয়া সীমান্তে র নিকটবর্তী স্থান ছিল। এখানে বনু কু যাআ' গোত্রের শাখা বনু কালব-এর লোকেরা বসবাস করতো। এখানে অনেক বড়ো বাণিজ্যিক হাট বসতো যেটি বনু কালব গোত্রের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল।

[দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) ৭ম খণ্ড, পৃ: ২৪৯]

দূমাতুল জান্দাল নামকরণের কারণ হলো, সেখানে একটি দু র্গ ছিল যেটি বিশেষ ধরনের পাথর দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছিল। দূমাহ শব্দটি সেই জায়গার জন্যও ব্যবহৃত হয় যেখানে বন্যার ঢল বা জলোচ্ছ্বাসের কারণে সৃষ্ট গোলাকার পাথর বহুল পরিমাণে জমা হয়ে যায়। এই জায়গাকে দূমাহ বলার আরেকটি কারণ হলো, হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর দুই পুত্র দূমাহ অথবা দূ মানের প্রতি এটি আরোপিত হয়।যাহোক, এগুলো হলো উক্ত স্থানের নামকরণের (ঐতিহাসিক) পটভূমি। এই যুদ্ধাভিযানের ইতিহাস এবং সৈন্যসংখ্যা সম্পর্কে লেখা আছে, সকল ঐতিহাসিক এবং জীবনীকারদের মতে পঞ্চম হিজরীর রবিউল আউয়ালের ২৫ তারিখে এই যুদ্ধাভিযান সংঘটিত হয়েছিল।

[দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) ৭ম খণ্ড, পৃ: ২৪৯-২৫০]

এর প্রেক্ষাপট কী ছিল- এ সম্পর্কে লেখা আছে যে, এখন পর্যন্ত বিরোধীদের সাথে যতগুলো যুদ্ধাভিযানের ঘটনা ঘটেছে সেগুলো কমবেশি মদীনা ও হেজায অঞ্চলের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল। এটিই প্রথম যুদ্ধাভিযান ছিল যেটি মদীনা থেকে প্রায় পনের দিনের দূরত্বে রোমান সাম্রাজ্যের অধীন সিরিয়া প্র দেশের সীমান্তবর্তী স্থানে সংঘটিত হতে যাচ্ছিল। এর প্রে ক্ষাপট হলো, মুসলমানদের কাছে উপর্যুপরি পরাজিত হয়ে এবং মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব-প্র তিপত্তি অনুভব করে ধর্মের শত্রুরা এমন একটি সুযোগের সন্ধানে ছিল যেন তারা ইসলাম এবং মুসলমানদের সমূলে উৎপাটন করতে পারে। এই অভিপ্রায় বাস্তবায়নের জন্য মদীনার একেবারে উত্তরে সিরিয়ার সীমান্ত সংলগ্ন দূমাতুল জান্দালের চতুষ্পার্শ্বের গোত্রগুলো ইসলামী রাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করে একটি বিশাল সেনাদল গঠন করতে আরম্ভ করে। (তারা চ্যালেঞ্জ দেয় যে, আমরা মদীনায় আক্রমণ করব)। এরা বাণিজ্য কাফেলাকে লুট করতো। [তারা কেবল চ্যালেঞ্জ দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি বরং নৈরাজ্যও সৃষ্টি করে রেখেছিল এবং বাণিজ্য কাফেলা লুট করতো]। যে মুসলমানকেই পেতো, তাকেই বিভিন্ন ধরনের কষ্ট দিতো। মহানবী (সা.)-কে দূমাতুল জান্দালের এসব গোত্রেরউল্লিখিত সব অপকর্মের সংবাদ দেওয়া হলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, দূমাতুল জান্দালের গোত্রগুলো কোনো বিশাল সেনাদল গঠন করে মদীনায় আক্রমণ করার পূর্বেই তাদের এলাকায় গিয়ে তাদেরকে এমনভাবে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া উত্তম হবে যেন তারা মদীনায় আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকে এবং বাণিজ্য কাফেলা নিরাপদে সিরিয়ায় পৌঁছতে পারে। (গাযওয়াত ওয়া সারায়া, পৃ: ২৪৪-২৪৫)

এর প্রস্তুতি সম্পর্কে লেখা আছে, মহানবী (সা.) মুসলমানদেরকে সেনাদল গঠন করে যাত্রা করার নির্দেশ প্রদান করেন এবং হযরত সিবা বিন উরফাতাহ্ গিফারী (রা.)-কে মদীনায় (তাঁর) স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন আর মহানবী (সা.) এক হাজার সাহাবী সমন্বিত সেনাদল নিয়ে যাত্রা করেন। তিনি (সা.) সারা রাত সফর করতেন এবং দিনের বেলা লুকিয়ে থাকতেন। বনু উযরার এক সদস্য পথপ্রদর্শক হিসেবে তাঁর (সা.) সাথে ছিল। তার নাম ছিল মাযকূর। সে একজন অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শক ছিল। সে ত্বরিত রওয়ানা হয় এবং সে সফরের জন্য অপরিচিত পথ বেছে নেয় যেন শত্রুরা টের না পায়। মহানবী (সা.) যখন দূমাতুল জান্দালের নিকটে পৌঁছেন তখন পথপ্রদর্শক বলে, এটি বনু তামীম গোত্রের চারণভূমি। এখানে তাদের উট ও গবাদি পশু রয়েছে। আপনি এখানে অবস্থান করুন আর আমি খবরাখবর নিয়ে আসি। মহানবী (সা.) বলেন, ঠিক আছে। এরপর উযরী তথ্য সংগ্রহের জন্য একাই বের হয়ে যায়। সেখানে চতুষ্পদ প্রাণী ও ছাগলের চিহ্ন দেখতে পায় এবং এটিও দেখে যে, তারা তাদের আশ্রয়স্থলে লুকিয়ে আছে। এরপর সে মহানবী (সা.)-এর নিকট ফেরত আসে এবং এই সংবাদ দেয় যে, সে তাদের অবস্থান সম্পর্কে জানতে পেরেছে। মহানবী (সা.) সেখান থেকে রওয়ানা হন এবং তাদের পশুপাল ও রাখালের ওপর আক্রমণ করেন; এর মধ্য হতে কিছু করতলগত করেন এবং বাকিগুলো পালিয়ে যায়। দূ মাতুল জান্দালের লোকেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, যারা সেখানে লুকিয়ে ছিল এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। মহানবী (সা.) তাদের ময়দানে শিবির স্থাপন করেন। মহানবী (সা.) সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করেন এবং বিভিন্ন দলকে চতুর্দিকে প্রেরণ করেন। ইসলামী সেনাদলনিরাপদে মহানবী (সা.)-এর নিকট ফিরে আসে। প্রত্যেক দল কিছু উট সঙ্গে করে নিয়ে আসলেও তারা কোনো মানুষ (খুঁজে) পায় নি। তাদের মধ্য থেকে কেবলমাত্র মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) তাদের মধ্য হতে একজনকে মহানবী (সা.)-এর নিকট ধরে নিয়ে আসেন। মহানবী (সা.) সেই ব্যক্তির কাছে তার সঙ্গীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। সে বলে, গত রাতে তারা যখন জানতে পারে যে, আপনি তাদের পশুপাল ধরে নিয়ে গেছেন- তখন তারা পালিয়ে গেছে। মহানবী (সা.) তাকে ইসলামের (প্র তি) আহ্বান জানালে সে মুসলমান হয়ে যায়। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৪২)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)ও এ সম্পর্কে লিখেছেন। দূমাতুল জান্দালের যুদ্ধাভিযান সম্পর্কে লেখেন, দূ মাতুল জান্দাল সিরিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকা ছিল এবং মদীনাথেকে এর দূরত্ব ১৫-১৬ দিনের কম ছিল না। এই যুদ্ধাভিযানের প্রেক্ষাপট হলো, মহানবী (সা.) এই সংবাদ লাভ করেন যে, দূমাতুল জান্দালে অনেক লোকজন একত্রিত হয়ে লুটপাট করছে আর যে পথিক ও কাফেলা প্রভৃতি সেখান দিয়ে অতিক্রম করে তাদের ওপর আক্রমণ করে তাদেরকে উত্যক্ত করে এবং তাদের মালামাল লু ট করে নেয়। আর পাশাপাশি এই আশঙ্কাও সৃষ্টি হয়েছে যে, পাছে এই লোকেরা আবার মদীনা অভিমুখী হয়ে মুসলমানদের জন্য দুশ্চিন্তার কারণ না হয়ে দাঁড়ায়।

কেননা, মহানবী (সা.)-এর সামরিক অভিযানের একটি গুরুত্ব পূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। [মহানবী (সা.)-এর সমরাভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল শান্তি প্রতিষ্ঠা।] তাই যদিও এদের এই লুটপাট প্রকৃত অর্থে মদীনার মুসলমানদের জন্য কোনো আশঙ্কার কারণ ছিল না, তথাপি তিনি (সা.) সাহাবীদের নির্দেশ প্রদান করেন, এই ডাকাতি ও অন্যায়কে প্রতিহত করার জন্য সেখানে যাওয়া উচিত। কাজেই, মহানবী (সা.)-এর আহ্বানে এক হাজার সাহাবী এই দূরদূরান্তের কষ্টদায়ক সফর করে তাঁর (সা.) সাথে যান। আর তিনি (সা.) পঞ্চম হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে মদীনা থেকে যাত্রা করেন এবং ১৫-১৬ দিনের দীর্ঘ ও কষ্টদায়ক দূরত্ব অতিক্রম করে দুমাতুল জান্দালের নিকটে পৌঁছেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে জানা যায় যে, এরা মুসলমানদের আগমনবার্তা পেয়ে এদিক-সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে গিয়েছিল আর যদিও মহানবী (সা.) সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করেন এবং তিনি (সা.) ছোটো ছোটো সৈন্যদলও বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করেন, যেন সেসব নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়, কিন্তু তারা এমনভাবে নিখোঁজ হয়ে যায় যে, তাদের কোনো চিহ্নও তারা খুঁজে পায় নি। যদিও তাদের একজন রাখাল মুসলমানদের হাতে বন্দি হয়ে মহানবী (সা.)-এর তবলীগে মুসলমান হয়ে যায়। অতঃপর মহানবী (সা.) সেখানে কিছুদিন অবস্থান করার পর মদীনায় ফেরত আসেন।" (সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ: ৫৪০,৫৪১)

দুমাতুল জান্দাল থেকে ফেরত আসার বিষয়ে লেখা আছে যে, মহানবী (সা.) প্রায় তিন দিন অবস্থানের পর পুরো সেনাবাহিনীর সাথে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে ২০ রবিউস সানী তারিখে মদীনায় ফিরে আসেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৪২) [দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) ৭ম খণ্ড, পৃ: ২৫১]

একজন লেখক দুমাতুল জান্দাল-এর যুদ্ধাভিযানের উদ্দেশ্যাবলির উল্লেখ করতে গিয়ে লেখেন যে, মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টিপটে এ যুদ্ধের বেশ কয়েকটি উদ্দেশ্য ছিল। এটি নিজ সত্তায় যদিও যুদ্ধ ছিল না, তথাপি এর মাধ্যমে সমগ্র আরব উপদ্বীপের উত্তর দিকের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার এবং পর্য বেক্ষণ করার সুযোগ লাভ হয়। গোটা আরব উপদ্বীপে ক্ষমতার মূল উৎসসমূহের অন্বেষণ করাও এর লক্ষ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল। একইসাথে দুমাতুল জান্দাল-এর যুদ্ধাভিযান স্বীয় পরিণাম ও ফলাফলের দিক থেকেও অনেক কল্যাণকর সাব্যস্ত হয়। সেখানকার পুরো অঞ্চল সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয় আর এটিই উদ্দেশ্য ছিল যেন এলাকা সম্পর্কে জানা যায়, অধিকন্তু সেখানে যে অন্যায় হচ্ছে তাও নির্মূল করা যায়। যাহোক, তিনি লেখেন, কার্যত না হওয়া এই যুদ্ধ ঐশী অনুগ্রহের অধীনে মুসলমানদের জন্য আগামী দিনের বিজয় ও সাহায্যের ফলাফল একত্রিত করছিল। এটি একটি সামরিক অভিযান ছিল যা প্রকৃত অর্থে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য যুদ্ধের দ্বার রুদ্ধকরণ ছিল। মূলত যুদ্ধ হবার যে সম্ভাবনা ছিল সেটিকে দূর করার জন্য এ অভিযান পরিচালিত হয়েছিল, কেননা এতদঞ্চলের অনেকগুলো আরব গোত্র মদীনায় আক্রমণের সংকল্প রাখত। এছাড়া এটি একটি রাজনৈতিক যুদ্ধও ছিল- যা সেসব গোত্রের সম্ভাব্য আক্রমণকে প্রতিহত করেছে যারা উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক পরাজয়কে কাজে লাগিয়ে মদীনার ওপর চড়াও হওয়ার স্বপ্ন দেখছিল। এই যুদ্ধাভিযানের একটি উদ্দেশ্য আরবদের এ প্রবৃত্তিগত ভয় দূর করাও ছিল যে, তারা কখনো রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না। [কেবল একটি উদ্দেশ্যনয়, বরং আরবদের মাঝে যে প্রবৃত্তিগত প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, আমরা কখনো রোম সাম্রাজ্যের মোকাবিলা করতে পারব না- সেটিও এ যুদ্ধাভিযানের ফলে দূর হয়ে যায়।]তাদেরকে কার্যত এই বিশ্বাসে উপনীত করাও উদ্দেশ্য ছিল যে, তাদের বাণী পুরো বিশ্বের জন্য, (এটি) কেবল আরব পর্য ন্ত সীমাবদ্ধ নয়। এ যুদ্ধাভিযান মুসলমানদেরকে এ বিষয়েও আশ্বস্ত করে। এসব ত্বরিত ও দূরদর্শী পদক্ষেপ এবং সুদক্ষ প্র জ্ঞার ভিত্তিতে প্রণীত পরিকল্পনারমাধ্যমে মহানবী (সা.) ইসলামী রাষ্ট্রে শান্তি ও নিরাপত্তা বহাল করতে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণেসফলতা অর্জন করেন আর সময়ের স্রোতকে মুসলমানদের অনুকূলে ঘুরিয়ে দেন এবং অনবরত যে-সব অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সমস্যাবলির সম্মুখীন হতে হচ্ছিল সেগুলোর প্রচণ্ডতা হ্রাস করেন, যা চতুর্দিক থেকে তাদেরকে ঘিরে রেখেছিল। এই যুদ্ধাভিযানের ফলে অনেক বিরুদ্ধবাদীও বিরত হয়। অভ্যন্তরীণভাবে মুনাফিকরাও সংযত হয়, এমনকি মুনাফিকরা নিশ্চুপ ও হতাশ হয়ে বসে পড়ে। আরবের বেদুঈনরা শিথিল হয়ে যায় এবং মুসলমানরা ইসলাম প্রচার ও সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক-প্রভুর বাণী প্রচার করার সুযোগ লাভ করে।

(সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৭ম খণ্ড, পৃ: ১৪০)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব, যিনি 'সীরাতুন নবী' বিষয়ে অনেক গবেষণা করেছেন, তিনি এ বিষয়ে লেখেন যে, এ যুদ্ধাভিযান এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রথম যুদ্ধাভিযান ছিল যে, এর লক্ষ্য অথবা কমপক্ষে বড়ো উদ্দেশ্য ছিল দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

দুমাবাসীদের সাথে মুসলমানদেরকোনো বিবাদ ছিল না। তারা মদীনা থেকে এতটাই দূরে ছিল যে, বাহ্যত তাদের পক্ষ থেকে এই আশঙ্কা কোনো প্র কৃত বিপদের কারণ হতে পারতো না যে, তারা এত দীর্ঘ সফরের কষ্ট স্বীকার করে মদীনায় মুসলমানদের চিন্তার কারণ হবে। অতএব তাদের মোকাবিলা করার জন্য পনেরো-ষোলো দিনের কষ্টদায়ক সফরের উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে এটি ছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, তারা তাদের এলাকায় ছিনতাই ও রাহাজানির যে কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছিল এবংনিরপরাধ কাফেলা ও যাত্রীদেরকে তারা যে উত্যক্ত করত- সেটির অবসান ঘটানো। সুতরাং মুসলমানদের এই অভিযান শুধুমাত্র জনকল্যাণ ও দেশের সামগ্রি ক হিতসাধনের জন্য ছিল,যাতে তাদের ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ দৃষ্টিপটে ছিল না। আর এটি সেসব লোকের উদ্দেশ্যে একটি ব্যবহারিক জবাব যারা নিতান্ত অন্যায় ও অবিচারের সাথে মুসলমানদের প্রাথমিক যুদ্ধাভিযানগুলোকে, যা তারা মহানবী (সা.)-এর নির্দেশের অধীনে করেছিল, আক্রমণাত্মক বা ব্যক্তিস্বার্থজনিত বলে আখ্যায়িত করেছে। এই যুদ্ধাভিযানের একটি ফল তো এটি হয়েছে যে, এতে দুমাবাসী ভীত হয়ে তাদের নৈরাজ্যমূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত হয় আর অত্যাচারিত মুসাফিররা এই অত্যাচার থেকে মুক্তি লাভ করে। আর দ্বিতীয়ত সিরিয়ার সীমান্তে, যেখানে এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র মুসলমানদের নামই পৌঁছেছিল আর মানুষ ইসলামের বাস্তবতা সম্পর্কে পুরোপুরি অনবহিত ছিল, তারা ইসলামী রীতিনীতির সাথে পরিচিত হয় এবং সেই এলাকার লোকেরা মুসলমানদের রীতি ও সভ্যতা সম্পর্কে কিছুটা অবগত হয়। 'দুমাতুল জান্দাল'-এর আশপাশে কিছু খ্রিষ্টান বসতিও ছিল, কিন্তু রেওয়ায়েতসমূহে এটি উল্লেখ নেই যে, এই নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীরা কি খ্রি ষ্টান ছিল নাকি মূর্তিপূজারি মুশরিক ছিল; কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় সম্ভবত এই লোকেরা মুশরিক হয়ে থাকবে, কেননা এই অভিযান যদি খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে হতো তাহলে ঐতিহাসিকরা অবশ্যই এর কথা উল্লেখ করত।" (সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ: ৫৪১)

অর্থাৎ খ্রিষ্টান ইতিহাসবিদরা তো অবশ্যই এর উল্লেখ করত। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন। মোটকথা, এসব যুদ্ধাভিযানের মাধ্যমে এটিই প্রমাণিত হয় যে, এসব যুদ্ধাভিযান শত্রুদের অনিষ্টকে প্রতিহত করা ও তাদের দুরভিসন্ধিকে নিঃশেষ করা এবং সর্বজনীন নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছিল, কোনো হত্যাযজ্ঞ ও অবৈধ হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্যে এবং শান্তি বিনষ্ট করার লক্ষ্যে করা হয় নি। সুতরাং ইসলাম এবং মহানবী (সা.)-এর ওপর যে অপবাদ রয়েছে এসব ঘটনা তার খণ্ডন করছে, কেননা যখন যুদ্ধ হলো না তখন মানুষ স্বাচ্ছন্দ্যে ও শান্তিপূর্ণভাবে ফিরে আসে এবং কারো কোনো ক্ষতি হয় নি। আর মুসলমানদের এই অভিযানের ফলে অত্র এলাকাতে সামগ্রিকভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ এই নির্যাতন থেকে কেবল মুসলমান কাফেলাগুলোই পরিত্রাণ লাভ করেনি বরং অন্যান্য কাফেলাও পরিত্রাণ লাভ করেছে। এই দুটি যুদ্ধাভিযানের বর্ণনা এখানেইশেষ হচ্ছে।

পুনরায় আমি দোয়ার প্রতি সবার মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। দোয়া করুন আল্লাহ্তা'লা পৃথিবীতে সামগ্রিকভাবে শান্তি প্র তিষ্ঠা করুন। সেই শান্তি যার জন্য মহানবী (সা.)-ও স্বীয় যুগে চেষ্টা চালিয়েছেন, আর তাঁর আগমনের উদ্দেশ্যও এটিই ছিল এবং ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্যও তা-ই। আর এই সবকিছুই আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহে হতে পারে। এর জন্য দোয়া করা প্রয়োজন। বাহ্যত এটিই মনে হচ্ছে যে, জগদ্বাসী এখন নিজেদেরই পায়ে কুঠারাঘাত করতে উদ্যত, বাহ্যিকভাবে শান্তির কোনো উপায় দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। অপরদিকে এই পশ্চিমা দেশগুলোতেও এখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে কর্মকাণ্ড আরও বেশি জোরদার হচ্ছে আর ধারণা করা যাচ্ছে, আগামীতে হয়ত তা আরও বৃদ্ধি পাবে। এ কারণেওমুসলমানদেরকে নিজেদের স্থায়ীত্বের উপকরণ সৃষ্টি করতে হবে। তাদেরকে একতাবদ্ধ হতে হবে। নিজেদের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে হবে। আল্ল াহ্ তা'লা করুন, তারা যেন এই বিষয়টি অনুধাবন করতে পারে। মুসলমান দেশসমূহে যেমন সুদান ইত্যাদি দেশে মুসলমানরাই মুসলমানদের ওপর নির্যাতন করছে, এর জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও শান্তি প্রতিষ্ঠার তৌফিকদিন। নিজেদের ধর্মের যে উদ্দেশ্য- সেটিকেই তারা ভুলে গেছে, নিজ ভাইদেরই তারামারছে। আর এ কারণেই অমুসলিমরাও মুসলমানদের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে।

আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে নিজেদের আমিত্ব ও ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার পরিবর্তে দেশ ও জাতির সেবক হওয়ার তৌফিক দিন আর শান্তি বিনষ্টকারী হওয়ার পরিবর্তে শান্তি প্র তিষ্ঠাকারীতে পরিণতকরুন। (আমীন)

*** সমাপ্ত ***

(২পাতার পর....)
সামনে নত হওয়া বৈধ নয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এটা তাদের একটা প্রথা, তাদের সালাম করার রীতি। তারা এভাবে নত হয়েই সালাম করে। পাকিস্তান ও ভারতের মত এশিয়ান দেশগুলিতেও এমন রীতি রয়েছে। অনেক সময় আমরা বুকে হাত রেখে নত হয়ে সালাম করলে তা শিরক নয়। অনুরূপভাবে এটাও তাদের রীতি ও ঐতিহ্য, তাদের সালাম করার পদ্ধতি, তারা এভাবে নত হয়েই সালাম করে। ইবাদতের জন্য তো আর নত হয় না। তারা সামনের ব্যক্তিকে খোদা মনে করে নত হয় না বার তার কাছে কোন কিছু পাওয়ার আশা করে না। এটা এক ধরণের সৌজন্য বিনিময়, যেটার বহিঃপ্রকাশ ঘটে নত হওয়ার মধ্য দিয়ে এবং বোঝাতে চায় যে তারা কতটা সম্মান প্রদর্শন করছে। জাপানের মত আরও অনেক স্থানে মেয়েরা যখন সালাম করতে আসত, তখন আমি মেয়েদের সঙ্গে করমর্দন না করে যৎসামান্য নত হয়ে আসসালামো আলাইকুম বলতাম। এর দ্বারা তারা উপলব্ধি করত যে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে। তাই আসল বিষয় হল অপরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। একটি নীতি স্মরণ রাখবেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, 'ইন্নামাআল আমালু বিন্নিয়াত' অর্থাৎ কর্ম নিয়্যত বা সংকল্পের উপর নির্ভরশীল। যদি তুমি কারো কাছে কিছু চাওয়ার জন্য এবং তাকে খোদা মনে করে তার সামনে নত হও তবে তা শিরক। আর তা যদি হয় কেবল সৌজন্য প্রদর্শনের মাধ্যমে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আর একটু সামনে মাথা নত করা হয়, বা সামান্য কোমর ঝুঁকানো হয় তবে তাতে কোন অসুবিধা নেই। এটা কোন শিরক নয়।

প্রশ্ন: আরও এক নাসেরা প্রশ্ন করে যে, লাহোরী জামাত আমাদের থেকে কি কারণে পৃথক হয়েছিল?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: পার্থক্য এতটুকু যে, লাহোরী জামাতের সদস্যরা দাবি করত যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল এর যুগেও এই ধারা সূচিত হয়, তারা বলত, খিলাফত আঞ্জুমানের অধীনস্ত হওয়া উচিত আর আঞ্জুমানের কর্মকর্তাগণ জামাত পরিচালনা এবং জামাত থেকে মুনাফা লুটতে চাইত। হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল বলেছিলেন, যুগ খলীফাকে আল্লাহ্ তা'লা সকল ক্ষমতা দান করেছেন আর এটাই ইসলামী রীতি। তাই খলীফা আঞ্জুমানের অধীনস্ত হতে পারে না। যাইহোক, সেই সময় তারা খলীফা আওয়ালের ছয় বছর সময় সহন করেছিল, কিন্তু যখন খলীফা সানির নির্বাচন হল, তখন বড় বড় মৌলবী জামাতের পদে আসীন ছিল। তারা বলল, খিলাফত হওয়া উচিত নয়। আর তাদের আশঙ্কা ছিল মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফা নির্বাচিত হবেন। তাই তারা হৈচৈ বাধিয়ে বলল, আমরা খিলাফত মানি না। হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফা সানি বললেন, খিলাফত তো অবশ্যই হওয়া উচিত। তোমাদের যদি সন্দেহ থাকে যে আমি খলীফা হয়ে যাব, তবে আমার খলীফা হওয়ার কোন বাসনা নেই। তোমরা চাইলে তোমাদের মধ্য থেকে কোন একজনকে আমরা খলীফা হিসেবে গ্রহণ করছি, কিন্তু খিলাফত অবশ্যই হবে, যার উপর আমরা একত্রিত হব, সে মৌলবী মহম্মদ আলী সাহেব হন বা অন্য কেউ। যে কোন কাউকে আমরা খলীফা হিসেবে মেনে নিব। তারা বলল, না, না, আমরা জানি, জামাতের সদস্যরা আপনাকেই খলীফা নির্বাচিত করেছে। তাই তারা খিলাফতকেই অস্বীকার করে বসল। আর আল্লাহ্ তা'লা তো এই প্রতিশ্রুতি দান করেছিলেন যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর পর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে আর এটাই হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর রচনা আল ওসীয়ত পুস্তিকায় যে ওসয়ীত ব্যবস্থাপনার সূচনা করেছিলেন, সেখানেও তিনি ওসীয়ত করেছিলেন যে, আমার পর খিলাফত হবে। তাই এই খিলাফত তো অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হওয়া অনিবার্য ছিল। আঁ হযরত (সা.)-এর হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে যে, খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু এরা খিলাফতকে মানতে প্রস্তুত ছিল না। তাই তারা জামাত আহমদীয়া থেকে পৃথক হয়ে লাহোর চলে গেছে আর সেখানে গিয়ে নিজেদের জামাত প্রতিষ্ঠিত করেছে। জামাতের যত সম্পদ ছিল সেটাও তারা সঙ্গে করে নিয়ে চলে যায়। অনেক বড় বড় উলেমা তাদের সঙ্গে চলে যায়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যেহেতু খিলাফতকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছিলেন, তাই তাদের জামাত কিছুকাল পরেই একেবারে বিলুপ্ত হতে হতে একেবারে শেষ হয় যায়। কিনউত জামাত আহমদীয়া, যা খিলাফতের সঙ্গে ছিল, যার সঙ্গে খিলাফতের সম্পর্ক ছিল, সেটা কালক্রমে বৃদ্ধি পেতে পেতে এখন পৃথিবীর দু'শ বারোটি দেশে পৌঁছে গিয়েছে। তাই মতানৈক্য যা দেখা তা হল এই যে, তাদের বড় বড় উলেমারা বলত, আমরা কর্মকর্তাদের কাছেই সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত থাকবে আর যুগ খলীফার কোন ক্ষমতা থাকবে না। বরং তারা কোন খলীফাই চাইত না, তারা চাইত কেবল আঞ্জুমান থাকুক।তাই তারা একথা মানে নি আর জামাতের সদস্যরাও মানে নি। এর পর তারা ক্ষুন্ন হয়ে লাহোর চলে যায় আর সেখানে গিয়ে পৃথক জামাত প্রতিষ্ঠা করে, যাদেরকে পয়গামী, গায়ের মোবাঈ অথবা লাহোরীও বলা হয়, যারা খিলাফতের বয়আত করে নি। কিন্তু এখন দেখুন, সেই সব বড় বড় লোকগুলো যারা মনে করত যে, কাদিয়ান ধ্বংস হয়ে যাবে আর বলে বেড়াত যে, কাদিয়ানের কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, ধুলিস্যাৎ হয়ে যাবে, কিন্তু কাদিয়ান ক্রমশ উন্নতি করতে থাকল। হিজরতের পর পাকিস্তানেও মরকয তৈরী হল। পৃথিবীর আরও অনেক স্থানে জামাত প্রতিষ্ঠিত হল, কিন্তু এই পয়গামীরা হাতে গোণা কয়েকটি স্থানেই সীমাবদ্ধ। বর্তমানে জার্মানীর বার্লিনে তাদের সব থেকে বড় ও পুরোনো মসজিদ রয়েছে। কিন্তু সেই মসজিদে নামায পড়ানোর জন্য কোনও ইমামও পাওয়া যায় না। অনেক খোঁজাখুজি করে কাউকে পাওয়া গেলেও দুই-তিন মাস পর সেও চলে যায়। পক্ষান্তরে আমাদের বার্লিনের মসজিদ নামাযীতে পূর্ণ থাকে। আমি যখন বার্লিন যাই, তাদের মসজিদও দেখতে গিয়েছিলাম। সেই সময় যুক্তরাষ্ট্র থেকে এক যুবক এসেছিল। সে বলছিল, আমিই তাদের ইমাম, এখানে আমি অস্থায়ীভাবে এসেছি। তার মধ্যে না ছিল ইমামের কোন ছাপ, না ছিল কোন ধর্মীয় জ্ঞানের প্রশিক্ষণ। অল্পবিস্তর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বইপুস্তকও তারা প্রকাশ করে, যেহেতু তাদের কাছে অর্থ আছে। তাদের অনুসারীদের সংখ্য এখন অতি নগণ্য, কয়েক শয়ের বেশি হবে না। কিন্তু জামাত আহমদীয়া, যারা খিলাফতের সঙ্গে আছে, তাদের সংখ্যা নিরন্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। সেখানে মসজিদেও চারপাশে আমি দেখলাম, খোঁজ খবর নেওয়ার কোথাও কেউ ছিল না। ভীষন অব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ছিল, মসজিদের কোন পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ছিল না। কিন্তু আহমদীয়া জামাতকে দেখ, জার্মানীতেও নতুন নতুন মসজিদ নির্মিত হচ্ছে আর উন্নতি হচ্ছে। এগুলো খিলাফতের কারণেই হচ্ছে। অনুরূপভাবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ-যেমন আফ্রিকা, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, দ্বীপরাষ্ট্রসমূহে, যুক্তরাষ্ট্রে, ইউরোপ সর্বত্রই জামাত উন্নতি করছে। যেহেতু তারা খিলাফতকে অস্বীকার করেছিল, তাই জামাতকে ত্যাগ করেছিল। এর লোকসানও তারা প্রত্যক্ষ করেছে। তাদের মধ্যে অনেকে আছেন, যারা একথা স্বীকার করে যে, তারা খিলাফতকে ত্যাগ করে ভুল করেছে। আমি ফিজি গিয়েছিলাম, সেখানে পয়গামীদের মধ্য থেকে কয়েকজন আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যও এসেছিল, তারা বয়আতও করেছে। অনুরূপভাবে নিউজিল্যাণ্ডেও তারা এসেছিল, তারা বয়আত করে ধীরে ধীরে জামাতে ফিরে আসছে, যারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছে তারা ফিরেও আসে আর খিলাফতের ছত্রছায়ায় আশয় নিয়েছে।

প্রশ্ন: হাদীস থেকে জানা যায় যে, আঁ হযরত (সা.)এর প্রতি যখন ওহী নাযেল হত,তখন তাঁর এমন অবস্থা হত যে, শীতকাল হওয়া সত্ত্বেও তিনি ঘেমে যেতেন। আমার প্রশ্ন হল, এমনটা কেন হত আর সেই সময় কি তিনি শারিরিক কষ্ট অনুভব করতেন। অনুরূপভাবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর প্রতি ইলহাম হত, তখন তাঁরও কি অনুরূপ অবস্থা হত?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, ফিরিশতা যখন ওহী নিয়ে আসে, তখন একটা সময় আল্লাহ্ তা'লার প্রতাপ ও শ্রেষ্ঠত্বের ত্রাসে নবীগণ সব থেকে ভীত হন আর যখন ফিরিশতা বার্তা নিয়ে আসেন, তখন তার বোঝা এত বেশি থাকে যে, মানুষ কেঁপে ওঠে। এ বিষয়ে যার সঠিক ব্যুৎপত্তি রয়েছে, সেই সব থেকে বেশি এটা অনুভব করে। আঁ হযরত (সা.) যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হতেন তা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার ওহী যখন নাযেল হত, মনে হত যেন কয়েক টন বোঝা আমার উপর চাপানো হয়েছে আর ফিরিশতা সেই বাণী নিয়ে আসত। সেই ওহীর ওজন এত বেশি হয় যে, মানুষের হৃদয় তাতে কেঁপে ওঠে, যার মধ্যে খোদা তা'লার সত্তা সম্পর্কে সঠিক ব্যুৎপত্তি রয়েছে। এই কারণে এমন অবস্থা হত আর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর প্রতি যখন ইলহাম হত তাঁর এমন অবস্থা হত, যদিও তিনি সেই মর্যাদায় পোঁছতে পারতেন না যেখঅনে আঁ হযরত (সা.) পোঁছেছিলেন। কিন্তু তাঁরও এমন অবস্থা হত, যখন তাঁর দেহ কাঁপতে শুরু করত আর অনুভব করা যেত ওহী অবতীর্ণ হচ্ছে। যত শক্তিশালী ইলহাম হত ততবেশি তাঁর শরীরে প্রভাব পড়ত। কিছু সময়ের জন্য তিনি দুর্বলও হয়ে পড়তেন। পরে ধীরে ধীরে তার উপশম হত।

একজন নাসেরা হুযুর আনোয়ারকে বলে, স্কুলে বান্ধবীরা একথা বিশ্বাস করতেই চায় না যে সে নিজের ইচ্ছায় স্কার্ফ পরে থাকে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনি যদি স্কার্ফ পরে খুশি অনুভব করেন, তবে তারা অবশ্যই বিশ্বাস করবে যে, আপনাকে পরতে বাধ্য করা হচ্ছে না। তবে আপনি যদি মনমরা হয়ে থাকেন তবে তারা বলবে, আপনি মিথ্যা বলছেন। (আপনি বলতে পারেন) আমি এটিকে ভাল মনে করি তাই পরি। যাইহোক আপনি যদি আপনার বান্ধবীদেরকে বলেন যে, একটা বিশেষ খাবার আপনার খুব প্রিয়, আর বান্ধবীরা যদি বলে আপনি মিথ্যা বলছেন। তবে কি আপনি সেই খাবারটি খাওয়া ছেড়ে দিবেন? তাই প্রত্যেকের যেটা পছন্দ সে সেটাই করে থাকে। আর যেটা সে করুক, সেটা যদি খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হয়ে থাকে, তবে সেই কাজ তার আরও বেশি তৎপরাতার সাথে করা উচিত। তাকে বলা উচিত যে, আপনার স্কার্ফ আপনি নিজের ধর্মবিশ্বাসের অনুশাসন মেনে পরে থাকে আর সেটাও আপনি

হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর স্পেন সফর, ২০১৩ (মার্চ, এপ্রিল)

সাংবাদিক সম্মেলন

সম্মেলনের আয়োজক ডক্টর চার্লস ট্যানক হুযুর আনোয়ারের পরিচয় উপস্থাপন করেন। এরপর প্রশ্ন করার অনুমতি দেওয়া হয়।

একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন- ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলাম কখন অন্যায় ও অত্যাচার করার শিক্ষা দেয় নি, আর কারো উপর প্রথমে আক্রমণ করারও শিক্ষা দেয় নি। যখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে মক্কায় বিরোধীদের পক্ষ থেকে অত্যাচার বৃদ্ধি পেতে শুরু করল,তখন সাহাবাগণ ইথিওপিয়ায় হিজরত করেন এবং পরে আঁ হযরত (সা.) নিজেও এবং তাঁর সঙ্গে অন্যান্য সাহাবগণও মদিনায় হিজরত করেন। তাঁরা নিজে থেকে দেশ ত্যাগ করেছেন। কিন্তু কারো উপর জুলুম করেন নি। কিন্তু যখন বিরোধীদের পক্ষ থেকে জুলুম মাত্রাছাড়া হল, তখন খোদা তা'লা মুসলমানদেরকে আত্মরক্ষার অনুমতি দান করলেন। কুরআন করীমের ২২ নম্বর সূরার ৪১-৪২ নম্বর আয়াতে এর অনুমতি দান করে বলেন- তোমাদেরকে এই কারণে আত্মরক্ষা করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে যে, তোমাদের উপর জুলুম করা হয়েছে এবং কেবল এই কারণে তাদের ঘর থেকে নিষ্কাশিত করা হয়েছে যে, তারা বলে আল্লাহ্ তা'লার প্রভু-প্রতিপালক। এছাড়াও এজন্যও এই অনুমতি দান করেছেন যে, এখন যদি তাদেরকে প্রতিহত না করা হত, তবে উপাসনাগারগুলি ধ্বংস করে ফেলা হত, গীর্জা, ইহুদীরে উপাসনাগার এবং মসজিদও ধ্বংস করে ফেলা হত, যেখানে অধিকহারে আল্লাহ্র নাম স্মরণ করা হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: সমস্ত ধর্মের উপাসনাগারগুলির নিরাপত্তা বিধানের জন্য আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদেরকে আত্মরক্ষার অনুমতি দান করেছেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কুরআন করীমের এই শিক্ষানুসারে যদি কোথাও কোন উপাসনাগারে নিরাপত্তার প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে আহমদীরা এর জন্য প্রথম সারিতে অবস্থান করবে। আমাদের নীতিবাক্য হল='ভালবাসা সকলের তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে।' এটা শুধু মুসলমানদের জন্য নয় , বরং সকলের জন্য।

একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, একটা ধর্ম কিভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা বিশ্বাস করি যে, প্রত্যেকটি ধর্ম খোদার পক্ষ থেকে। এক লক্ষেরও বেশি আম্বিয়া পৃথিবীতে এসেছেন। কুরআন করীম অনুসারে প্রত্যেক এলাকা ও জনপদে নবী এসেছেন। এই সকল আম্বিয়া খোদার পক্ষ থেকে এসেছেন। যেহেতু খোদা এক-অদ্বিতীয়,তাই সকলের বাণীও এক ছিল। সকলে এক-ই খোদার বাণী প্রচার করেছেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন-যদি প্রত্যেকটি ধর্ম নিজের খোদার দিকে আহ্বান করে এবং এর অনুসারীরা খোদার বাণীর উপর আমল করে তবে সারা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

মাল্টা টেলিভিশন এর প্রতিনিধির একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: জামাত আহমদীয়া বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছে। জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তাঁর আগমণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'আমি মূলত দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে প্রেরিত হয়েছি। এক, মানবজাতিকে নিজেদের সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া, তাঁর সঙ্গে নৈকট্যের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। দুই প্রত্যেক ব্যক্তি যেন প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার প্রদান করে। যদি ন্যায় পরায়ণতার সাথে তাদের অধিকার প্রদান করা হয়, তবে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, মসীহ্র খলীফা হিসেবে আমি বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতাদেরকে শান্তির প্রতিষ্ঠার জন্য চিঠি লিখেছি। পোপকেও চিঠি লিখেছি। আমাদের প্রতিনিধিরা তাঁর হাতে চিঠি দিয়ে এসেছিল। তাঁকে লিখেছিলাম যে, আপনি খৃষ্টানদের প্রধান নেতা, তাই শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এগিয়ে আসা আপনার দায়িত্ব। আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সব সময় সাহায্যের জন্য প্রস্তুত আছি।

এক নাইজেরিয়ান বিশপ এর প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা সর্বত্রই শান্তি বাণী পৌঁছে দিচ্ছি। সর্বত্রই প্রচার করছি, মুসলমানদেরকে এবং খৃষ্টানদেরকে বলছি যে,শান্তি প্রতিষ্ঠা করুন। আপনি কখনও কোন নাইজেরিয়ান আহমদীকে অরাজকতা সৃষ্টি করতে কিম্বা অপরের অধিকার আত্মসাৎ করতে দেখবেন না। নাইজেরিয়ায় যে অরাজকতা চলছে জামাত আহমদীয়া তার নিন্দা করছে। কিছু কিছু স্থানে জামাতও এই সকল অরাজকতার শিকার হয়েছে। জামাত পত্রপত্রিকা ও সংবাদমাধ্যমে এগুলির নিন্দা করেছে।

এক ফরাসি সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন:

হুযুর আনোয়ার বলেন, দুই বছর পূর্বে আমি সাবেক পোপকে এই মর্মে চিঠি লিখেছিলাম যে, আপনি নিজের প্রভাব ও প্রতিপত্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে চেষ্টা করুন। আমরা আপনার সঙ্গে আছি। শান্তি প্রসারের কাজে আমরা হাতে হাত রেখে কাজ করব। যদি শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা না করা হয় আর পরাশক্তিগুলিকে যুদ্ধ থেকে বিরত না রাখা যায় তবে পৃথিবীতে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমার চিঠিটি জামাত আহমদীয়া কাবাবীর এর ন্যাশনাল সদর সাহেব এক সাক্ষাতের সময় পোপের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

এখন নতুন পোপকে আমি সাধুবাদ জানিয়ে বার্তা প্রেরণ করেছি এবং পুনরায় একই বার্তা তাঁকে দিয়েছি। অর্থাৎ আসুন আমরা সম্মিলিতভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে সচেষ্ট হই।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমরা সব সময় সম্মিলিতভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করতে প্রস্তুত এবং প্রত্যেকের সঙ্গে কাজ করার জন্য প্রস্তুত। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদেরকে যে কেউ ডাকুক না কেন, যে কেউ চেষ্টা করবে, মানবজাতির সেবার জন্য যে-ই আহ্বান করবে আমার এর জন্য প্রস্তুত।

মসজিদ বায়তুর রহমান এর প্রতিবেশি টাউন ওলাকাও এর মেয়র আন্টেনিও রোপেরো বলেন, মসজিদের জন্য এই জায়গাটির নির্বাচন করার জন্য আমি খলীফাতুল মসীহকে ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের কমিউনিটি ভালবাসার বাণীর প্রসার করছে। এখন আমরা ইসলামকে আরও ভালভাবে জানতে পারব। মেয়র সাহেব হুযুর আনোয়ারকে মসজিদ নির্মাণ হওয়ার জন্য সাধুবাদ জানান।

মসজিদ বায়তুর রহমান যে এলাকায় অবস্থিত সেই পোবলা ডে ভাল্লোবনা এর মহিলা মেয়র নিবেদন করেন, আমরা এখানে জামাতের সঙ্গে একবছর ধরে অবস্থান করছি। শুরুর দিকে আমাদের মনে আতঙ্ক ছিল আর বিরোধিতাও ছিল। এরপর আহমদীদের উন্নত আচরণ প্রকাশ পেতে শুরু করল, তারা নিজেদের মসজিদের পরিকল্পনা দেখাল, এইভাবে আমাদের সমস্ত ভয়ভীতি দূর হয়ে গেল। এখন এই মফসসলের সকলেই খুব ভাল। কোন সমস্যা নেই। আমরা প্রতিবেশীরা একে অপরকে পছন্দ করি আর মিলে মিশে থাকি।

একথা শুনে হুযুর আনোয়ার বলেন, আমি আশা করি ভবিষ্যতেও কোন সমস্যা হবে না। আমি মেয়র সাহেবকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই যে, তিনি মসজিদ নির্মাণের অনুমতি পাইয়ে দিতে অনেক সাহায্য করেছেন আর এই কাজে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমি এখানকার কাউন্সিল এবং প্রতিবেশীদেরও ধন্যবাদ জানাই যারা আমাদেরকে এখানে মসজিদ নির্মাণের অনুমতি প্রদান করেছে।

আমরা সকলে একত্রে কাজ করতে চাই আর আমরা সমাজে সমন্বিত হয়ে গেছি। আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমরা পুলিশদের জন্য সাহায্যকারী প্রমাণিত হব। পুলিশ কর্মকর্তারাও এসেছিলেন। হুযুর আনোয়ার বলেন, আমরা পুলিশদের জন্য অনুরূপভাবে সাহায্যকারী প্রমাণিত হতে পারি। যেমন- এলাকার মানুষ যদি পুলিশকে সাহায্য করে, মানুষজন ভাল হয়, তাদের পক্ষ থেকে কোন সমস্যা না হয়, অপরাধ না হয় তবে পুলিশের কাজও সহজ হয়ে যায়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে পুলিশের সাহায্য করা যেতে পারে।

ভ্যালেনসিয়া প্রদেশের পার্লামেন্টের সদর ডি জুয়ান কোটিনো বলেন, আমি আজকের অনুষ্ঠানে অনেক আনন্দসহকারে আসতে চাইছিলাম। আমার ইচ্ছে ছিল সেই সব মানুষদের সঙ্গে সাক্ষাত করার যারা শান্তির বিষয়ে কাজ করছে। আমি খলীফাতুল মসীহ আল খামিসকে এখানে ভ্যালেনসিয়ায় স্বাগত জানাই এবং এই প্রদেশের এই স্থানটিকে মসজিদ নির্মাণের জন্য নির্বাচিত করার জন্য সাধুবাদ জানাই।

পার্লামেন্টের সদর সাহেব বলেন, তিনি গোঁড়া ক্যাথলিক।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমি সেই ব্যক্তিকে পছন্দ করি যে নিজের ধর্মের প্রতি অটল বিশ্বাস রাখে। ধর্মই মানুষকে খোদা তা'লার দিকে নিয়ে যায় এবং খোদার সঙ্গে মিলিত করে। এবং মানবতার সেবার তৌফিক দান করে। খোদা তা'লার প্রতি ঈমানের কারণে, ধর্মের কারণে আপনি মানবতার সেবা করে থাকেন।

আমরা এই বার্তাই দিতে চাই যে, বিভিন্ন ধর্ম হওয়া সত্ত্বেও আমরা কিন্তু আমার মতে, এগুলো তাদের জন্য নিশ্চয় কষ্টদায়ক ছিল না। অন্তত আমি এই এলাকায় কোন

এরপর ১১ পাতায়.....

খুতবা ইলহামিয়া– এক ঐশী নিদর্শন

আল্লাহ্ তা'লা যখন তাঁর মনোনীত বান্দাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন তখন তাঁর সত্যতার জন্য অসংখ্য নিদর্শনাবলীও প্রদর্শন করে থাকেন। এই যামানার প্রত্যাদিষ্ট সর্বশেষ মোজাদ্দেদ, খাতামুল খোলাফা সাইয়্যেদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)–এর আবির্ভূত হওয়ার পরও আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সমর্থনে অসংখ্য নিদর্শন জগদ্বাসীকে দেখিয়েছেন। অন্যান্য নিদর্শন ছাড়াও আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে আমাদের পথ প্রদর্শক সাইয়্যাদুল কাওনাইন হযরত মুহাম্মদ (সা.)–এর মাতৃভাষা আরবীর উপর অগাধ ব্যুৎপত্তি ও প্রজ্ঞা দান করেছেন। তাঁকে আরবী ভাষার উপর অসাধারণ বাগ্মীতা ও এর উপর একজন সুসাহিত্যিকের সকল প্রকার অলংকারাদী শিক্ষা দিয়েছেন। এ সম্পর্কে প্রিয় নবী রাসূলে মকবুল (সা.)–এর এক মহান ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে গিয়ে তিনি (সা.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা ইমাম মাহদীকে এক রাতেই অকল্পনীয় যোগ্যতা প্রদান করবেন"। [আবু দাউদ শরীফ]

এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার লক্ষ্যে মহান সৃষ্টিকর্তা তাঁর প্রেরিত পুরুষ হযরত মির্যাগোলাম আহমদ কাদিয়ানী প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)–কে এক রাতেই চল্লিশ হাজার আরবী অর্থাৎ শব্দের মূল শিখিয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তিনি বাস্তবিক ক্ষেত্রে প্রচলিত শিক্ষা যৎসামান্যই অর্জন করেছিলেন। তিনি গুটি কয়েক শিক্ষকের কাছ থেকে কুরআন শরীফ, ইলমুস সারফ ও নাহব, ফারসি কিছু কিতাব, যুক্তি বিদ্যা, দর্শন শাস্ত্র এবং তাঁর পিতার লাইব্রেরী থেকে বই নিয়ে চিকিৎসা বিদ্যার উপর কিছু পড়াশুনা করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি তখনকার প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে কোন উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন নি। ফলশ্রুতিতে যখন তিনি 'মামুর মিনাল্লাহ্'(আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট) হওয়ার দাবী করেন, তখনই তৎকালীন উপমহাদেশের বড় বড় আলেম ও পন্ডিতগণ তাঁর পিছু লাগে এবং তাঁর বিরোধিতায় নিজেদের মুখের ফেনাকে অবারিত ধারায় বের করতে থাকে। তারা আশ্চর্য বিস্ময় নিয়ে বলতে থাকে, এই ব্যক্তিতো আরবী ভাষার ক, খ, গ–ও বুঝে না, আরবী সম্পর্কে তাঁর কোন জ্ঞান নেই সে কিভাবে খোদার পক্ষ থেকে আসতে পারে? সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর এ অবস্থার বিবরণ তুলে ধরতে গিয়ে বলেন–

"আরবী বাক্য গঠনের পদ্ধতি ও এর লিখন পদ্ধতি সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই ছিল না। না ছিলাম আমি কোন সুসাহিত্যিক, আমার কলম কারো সাহায্যের মুখাপেক্ষী যেমন ছিল না তেমনই আমি বিন্দুমাত্র জানতামও না 'বালাগাত' (ভাষার অলংকার শাস্ত্র) নামক এই শিল্প কিভাবে অর্জন করা যায়। সুতরাং এরূপ অবস্থার মধ্যে আমি এর নিঝুম গহীনে প্রবেশ করার জন্য ভবঘুরের ন্যায় চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করছিলাম এবং অবুঝ বালকের ন্যায় এই অথৈ সাগরে হাতড়ে বেড়াচ্ছিলাম। তখন একদা নূরের এক প্রভা আমার হৃদয়ে ঢেলে দেওয়া হল আর আলোক ও উজ্জ্বল এক মহা জ্যোতির বিকাশ ঘটিয়ে অবতীর্ণ হল। এরপরই আমি অনর্গল বক্তৃতা প্রদানকারী বাগ্মীতায় এক অনন্য পারদর্শী বক্তারূপে নিজেকে খুঁজে পেলাম। সুতরাং মোবারক! সেই খোদা যিনি সর্বোৎকৃষ্ট স্রষ্টা।

[হুজ্জাতুল্লাহ্, রূহানী খাযায়েন, ১২তম খণ্ড, পৃ. ১৭৮]

অতঃপর যে আলেম সমাজ তাঁর বিরোধিতায় উঠে পরে লেগেছিল তাদেরকে উদ্দেশ্য করে আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা বলেন–

"আরবী ভাষায় আমার কোন চেষ্টাপ্রচেষ্টা, পরিশ্রম সাধনা এবং ক্ষুদ্র অনুসন্ধান ব্যতীত যে উৎকর্ষতা ও ব্যুৎপত্তি অর্জিত হয়েছে তা আমার প্রভুর পক্ষ থেকে এক সুস্পষ্ট নিদর্শন। আর এটা আল্লাহ্ এ জন্য করেছেন, যেন সকল লোকদের উপর আমার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং সাহিত্যিক পান্ডিত্য প্রাধান্য পায়। অতএব, বিরুদ্ধবাদী দলগুলোর মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে আমার মোকাবেলায় দন্ডায়মান হয়?"

[আঞ্জামে আথম, আরবী অনুবাদ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড ১১, পৃ: ২৩৪]

নিদর্শনের বহিঃপ্রকাশ

আরবী ভাষায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর অসাধারণ উৎকর্ষতার নিদর্শন সেই সময় উর্ধ্বাকাশ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল যখন স্বয়ং খোদা তা'লা তাঁর পক্ষ থেকে এই মহান ঐশ্বরিক শক্তি ও সামর্থ্য তাঁকে প্রদান করেছিলেন এবং তিনি তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, "তুমি এই ইলহামী ভাষায় সর্বসাধারণের সামনে ভরপুর মজলিসে ফাসাহাত ও বালাগাতের সাথে তাৎক্ষণিক ও অবলীলায় স্বতঃস্ফূর্তচিত্তে বক্তৃতা প্রদান কর"।

খুতবায়ে ইলহামিয়ার প্রেক্ষাপট

আল হাকাম পত্রিকার মোহতরম সম্পাদক সাহেব এ সম্পর্কে লিখেন, "হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস্ সালাম এর আন্তরিক ইচ্ছা ও প্রত্যাশা যে, আমাদের মতো তাঁর অনুসারীগণ যেন বারবার দারুল আমান (কাদিয়ান) আগমন করেন। এখানে অবস্থান করে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় আত্মার পবিত্রতা অর্জন, বাতেনী শক্তি থেকে নিজেকে পবিত্রকরণ এবং হৃদয়ের মাঝে এক তাযাল্লিয়াত আনয়নের জন্য বাস্তবিক পথ নির্দেশনা গ্রহণ করেন। এ উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার জন্য আপনারা বছরে তিনটি জলসাকে নির্ধারিত করে রেখেছেন। যে জলসাগুলি ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা এবং বড় দিনের ছুটিতে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এগুলো ছাড়াও ধর্মীয় প্রয়োজনে আরো কিছু জলসা করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই জলসা যার সূচনা হেতু আপনাদেরকে সম্বোধন করে লেখছি– এটি সেই জলসাগুলোর মধ্যে থেকে একটি যা প্রতি বছর ঈদ উল আযহার সময় অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে"।

জলসার সংবাদের ব্যাপক প্রচার

এমনিতেই জামা'তের সদস্যগণ পূর্ব থেকেই জানতো ঈদ উল আযহার সময় একটি জলসা হয়ে থাকে আর এর সংবাদ কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে প্রচারও করা হয় না। কিন্তু আনন্দের বিষয় হল, আমাদের মোহসেন ও বন্ধুপ্রতিম মওলানা আব্দুল করীম সিয়ালকোটি যে একটি দীর্ঘ সময় ধরে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)–এর সহচার্যে অবস্থান করাকে নিজের জন্য আবশ্যক করে নিয়েছেন। তিনি তাঁর সহচার্যে থেকে ঈর্ষনীয় সফলতা ও উপকৃত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তিনি তার কামেল ঈমানের কারণে বন্ধুদেরকে সর্বদা দারুল আমান, কাদিয়ানে আগমন ও অবস্থান করার জন্য ক্লান্তিহীন দিক–নির্দেশনা ও অনুরোধ করে যাচ্ছেন। মু'মিনের বৈশিষ্ট্য তো এটাই যে, নিজের জন্য যা ভাল মনে করবে তা তাঁর অপর ভাইয়ের জন্যও পছন্দ করবে। সম্মানিত মওলানা সাহেবের সর্বদা একটাই আকুতি থাকে, যেন লোকেরা এখানে বেশি বেশি আসে এবং এখানে এসে যে দৃশ্য অবলোকন করে যা সে নিজে দেখেছে আর তাই অর্জন করে যা সে নিজে অর্জন করেছে। এইজন্য এ অবস্থাতেও সেই ঈমানী প্রেরণা ও উদ্দীপনায় প্রত্যেক শহরের বন্ধুদের নিকট তিনি ক্রমাগত চিঠিপত্র বিভিন্ন আবেগ ও প্রভাব সৃষ্টিকারী ভাষায় লিখে জলসায় যোগদানের তাহরীক করে তাদের নিকট প্রেরণ করতে থাকেন। মূলত এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হওয়ার পিছনে হযরত মওলানা মওসুফই নিমন্ত্রণদাতা ছিলেন আর তাঁর পত্রই জলসা অনুষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে সকলকে অবহিত করেছিল।

মেহমানদের আগমন

এপ্রিল মাসের প্রথম তারিখ থেকে শুরু করে ১০ এপ্রিলের মধ্যে মেহমানদের আগমন শুরু হয়ে গিয়েছিল। এ জলসায় সবচেয়ে বেশি বন্ধু সিয়ালকোট থেকে আগমন করেন আর এর পূর্বে কখনো এতো অধিক সংখ্যক বন্ধু সিয়ালকোট থেকে আগমন করেন নি। তারা একটি রিজার্ভ গাড়িতে করে বাটালা পর্যন্ত পৌঁছেছিল। যাই হোক, অমৃতসর, বাটালা, লাহোর, উজিরাবাদ, সিয়ালকোট, জম্মু, পেশওয়ার, গুজরাট, ঝেলাম, রাওয়ালপিন্ডি, কপুরথলা, লুধিয়ানা, বোম্বাই, লাক্ষ্ণৌ, সানওয়ার প্রভৃতি স্থান থেকে তিনশ' এর বেশি নিষ্ঠাবান, প্রেমিক আহমদী বন্ধু জলসায় অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে আগমন করেন।

আরাফাতের দিনও হুযূর আকদাসের (আ.) দোয়া

৯ জিলহজ্ব আরাফাতের দিন সকালে হযরত আকদাস ইমামে যামান আলাইহিস সালাম হযরত মওলানা নূরুদ্দীন (রা.)–কে একটি সংক্ষিপ্ত চিরকুট পাঠিয়ে বললেন, 'আমি আজকের দিন এবং রাতের বিভিন্ন অংশে আমার বন্ধুদের জন্য দোয়া করব বলে মনস্থির করেছি। এইজন্য যে সকল বন্ধুরা এখানে অবস্থান করছেন, তারা সকলে তাদের নাম ও ঠিকানা লিখে আমার কাছে পাঠিয়ে দেন যেন দোয়া করার সময় তাদের কথা আমার স্মরণ থাকে। এরপর হযরত মওলানা নূরুদ্দীন সকল বন্ধুকে একত্রিত করে এক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান করলেন এবং তাদেরকে হুযূর (আ.) প্রদত্ত নির্দেশনা অবগত করালেন।

অতঃপর তিনি নাম ও ঠিকানা সম্বলিত একটি তালিকা তৈরী করে হুযূরের খেদমতে পেশ করলেন। হুযূর (আ.) সে দিন ও রাতের একটি বড় অংশ ইবাদত বন্দেগীতে অতিবাহিত করলেন। যেহেতু সেদিন বন্ধুগণ অধিকহারে আসছিলেন এবং তারা সকলে হুযূরের সাথে সাক্ষাৎ লাভে উদগ্রীব ছিল কেননা কোন দেহেরই আত্মার উপস্থিতি ব্যতীত জীবন লাভ সম্ভব নয়। এই কারণে হুযূর (আ.) সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনা করে দ্বিতীয়বার এই সংবাদ প্রেরণ করলেন যে, আমার কাছে যেন কোন প্রকার চিরকুট পাঠানো না

হয়। এভাবে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। হযরত মওলানা নূরুদ্দীন সাহেব (রা.) পুণরায় বন্ধুদের একত্রিত করে এই আদেশ অবগত করালেন। এরপর মাগরিব ও এশার নামায জমা হল। নামায শেষে হুযূর (আ.) দাঁড়িয়ে সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'যেহেতু আমি খোদা তা'লার সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ যে, আজকের দিন ও রাতের কিয়দংশে আমি দোয়াতে কাটাবো এইজন্য এখন আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি যেন আমার কৃত ওয়াদা ভঙ্গ না হয়। এই বলে তিনি প্রস্থান করলেন এবং দোয়াতে নিমগ্ন হয়ে পড়লেন। সেই সময় তাঁর প্রস্থানের দৃশ্য দেখে এটা মনে হচ্ছিল যে, যেন মূসা (আ.) তাঁর শিষ্যদের রেখে তুর পর্বতে যাচ্ছেন। যাই হোক, সেই দিন ও রাতে হুযূর (আ.) অত্যন্ত আকুতি ও বিগলিত চিত্তে খোদার দরবারে দোয়াতে রত থাকলেন।

হুযূর আকদাস (আ.)-কে বক্তৃতা করার জন্য বারবার হযরত মৌলবী আব্দুল করীম সিয়ালকোটি (রা.) অনুরোধ করছিলেন। এ ব্যাপারে আল হাকাম পত্রিকার সম্পাদক সাহেব লিখেন, "হযরত মওলানা আব্দুল করীম সাহেব সিয়ালকোটি সচরাচর ঈদের জলসা আয়োজনের পূর্ব মুহূর্তের দিনগুলোতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় হুযূরের খেদমতে হাজির হয়ে তাঁকে বন্ধুদের উদ্দেশ্যে কোন বক্তৃতা করার অনুরোধ করতেন। ঈদের দিন সকালে মওলানা সিয়ালকোটি সাহেব হুযূর (আ.)-এর অন্দর মহলে প্রবেশ করে বললেন, আমি আজ বিশেষ ভাবে আপনার নিকট অনুরোধ করছি, আপনি দয়া করে বক্তৃতা করুন যদিও তা খুবই সংক্ষিপ্ত হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বললেন, "খোদাই তো আদেশ দিয়েছেন।" তারপর তিনি বললেন, রাতে ইলহাম হয়েছিল, যেন আমি কোন জনসমাবেশপূর্ণ সম্মেলনে আরবীতে বক্তৃতা প্রদান করি। এটা আমি অন্য কোন সমাবেশ হবে বলে মনে করেছিলাম। যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন হয়তোবা এটাই হল সেই সমাবেশ।

যাই হোক হযরত মওলানা সাহেবের এই তাহরীকের ফলে দুনিয়া এমন এক অতুলনীয় নেয়ামত লাভ করল যা বর্তমানে পুস্তকের আকার ধারণ করেছে। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস এই বক্তৃতার সাথে সাথে যে বরকত ও কল্যাণের প্রস্রবন ধারা জারী হয়েছে এর একটি বড় অংশ হযরত মওলানা সাহেব লাভ করবেন কেননা তিনিই তো জলসার মূল উদ্যোক্তা ও আয়োজনকারী ছিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) স্বয়ং অনেকবার তাঁর এই তাহরীকের বন্দনা গেয়েছেন।

[আল হাকাম, ১৭ এপ্রিল ১৯০০]

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত মুফতি মোহাম্মদ সাদেক সাহেব বলেন, "মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব এমন এক মহান ব্যক্তি যার প্রতিটি মতামত ও রায় খুবই অর্থবহ হতো। অনেক সময় আমি গভীর ভাবে লক্ষ্য করে একটি জিনিস দেখতে পেয়েছিলাম তা হল, হযরত ইমামে সাদেক ও মাসদুক আলাইহিস্ সালাম এর ইলহাম ও বাক্যাবলীর সাথে মওলানা সাহেবের কথা-বার্তার এরূপ সাদৃশ্য পাওয়া যেতো যেরূপ সাদৃশ্য একমাত্র দেখা যেতো হযরত উমর (রা.)-এর রায় ও মতামতে। কেননা কেবল হযরত উমর (রা.) -এর মতামতের প্রেক্ষিতে কখনো কখনো হযরত সারওয়ারে আম্বিয়া (সা.)-এর উপর ওহী অবতীর্ণ হতো।
[আল হাকাম, ১লা মে, ১৯০০]

হযরত মওলানা আব্দুল করীম সাহেব শিয়ালকোটি (রা.) ঈদ-উল আযহার নামায পড়ালেন। নামায শেষ হওয়ার পর হযরত আকদাস খুতবা দেওয়ার জন্য মসজিদে আকসার নীচের দরজায় দাঁড়িয়ে উর্দুতে এক আজিমুশ্বান খুতবা প্রদান করেন। অত:পর হুযূর (আ.) বলেন,

"এখন আমি আরবীতে কিছু কথা বলব। কেননা খোদা তা'লা আমাকে কোন সমাবেশে আরবীতে কিছু বলার জন্য আদেশ দিয়েছেন। প্রথমে আমি মনে করেছিলাম হয়তো বা অন্য কোন সমাবেশের কথা বলা হয়েছে যেখানে খোদার এই ঐশী বাক্য পরিপূর্ণতা লাভ করবে কিন্তু খোদা তা'লা মৌলবী আব্দুল করীম সাহেবকে অশেষ প্রতিদানে ভূষিত করুন। কেননা তিনিই আজকের এই সমাবেশের জন্য তাহরীক করেছেন আর এই তাহরীকের ফলশ্রুতিতে আমার হৃদয়ে এক শক্তিশালী প্রেরণা, বল সৃষ্টি হয়েছে এবং আশা করছি খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতি ও নিদর্শন আজ প্রকাশিত হবে।

[আল হাকাম, ১৭ এপ্রিল, ১৯৮০]

যুগ ইমামের বাণী

স্মরণ রেখো! কাজ তারাই করতে পারে, অর্থাৎ ধর্মের সেবা তারাই করতে পারে যাদের মধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতি বিদ্যমান।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

দোয়াপ্রার্থী: Jahanara Begum, Bhagbangola, (Murshidabad)

মহান এক নিদর্শনের বিকাশ

আল হাকাম পত্রিকার সম্পাদক লিখেন, "যখন হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) জনাবে মৌলবী আব্দুল করিম সাহেব সিয়ালকোটি ঘোষিত তাহরীক বক্তৃতা প্রদান শেষ করলেন তখন তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে 'ইলকা' পেয়ে পুনরায় আরবী ভাষায় খুতবা প্রদান করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। যেহেতু এই খুতবা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর মাঝে অন্যতম শক্তিশালী, অকল্পনীয় অবিশ্বাস্য নিদর্শন ছিল-যা আমাদের চর্মচক্ষুর সামনেই নয় বরং এক মহান দলের কেবল উপস্থিতিতে সংঘটিত হয়েছিল। আমরা খোদা তা'লার কসম খেয়ে বলছি, এই শক্তিমান নিদর্শন তাৎক্ষণিক এক বিস্ময়কর মোজেযা ছিল। আমরা দেখতে পেলাম হুযূর আকদাস (আ.) আরবীতে খুতবা প্রদান করার জন্য প্রস্তুতি নিলেন এবং হযরত মওলানা আব্দুল করীম সিয়ালকোটি সাহেব ও হযরত মৌলবী নূরুদ্দীন সাহেব (রা.)-কে হুকুম দিলেন তারা যেন তাঁর নিকটে এসে বসে এবং এই খুতবা লিখে রাখে। যখন হযরত মৌলবী সাহেবদ্বয় প্রস্তুত হলেন তখন হুযূর (আ.) "ইয়া ইবাদিল্লাহি" (হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ) বলে আরবীতে খুতবা প্রদান শুরু করলেন। খুতবা প্রদান করার সাথে সাথে হুযূরের পবিত্র চেহারায় অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা গেল, তাঁর চোখ, কান, নাক, কপাল এবং তাঁর কণ্ঠে ঐশী আভা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পেতে লাগল। তাঁর আওয়াজ গম্ভীর হয়ে উঠল। আমরা বুঝতে পারলাম এটা সরাসরি খোদার পক্ষ থেকে তৎক্ষণাৎ ইলহাম হচ্ছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) খুতবার মাঝখানে মৌলবী সাহেবদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "এখনই লিখে নাও, কোন শব্দ বুঝতে না পারলে সাথে-সাথে জিজ্ঞাসা করে নিও পুনরায় হয়তো এ কথা বলতে আর সক্ষম হয়ে উঠব না"

(আল হাকাম, ১লা মে ১৯০০)

সম্পাদক সাহেব আরো বলেন, "এই সম্মলনে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের অধিকাংশ আরবী জানতো না। কিন্তু হুযূর যখন বক্তৃতা করা শুরু করলেন তারা গভীর ধ্যানে নিমগ্ন শ্রোতার ন্যায় তা শুনতে থাকেন "যখন হুযূর (আ.) খুতবা প্রদান করে বসে পড়লেন তখন অধিকাংশ সদস্যদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে হযরত মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব (রা.) উঠে দাঁড়ালেন এবং সম্পূর্ণ খুতবা অনুবাদ করে শুনালেন।

দোয়া কবুলিয়্যত এবং সেজদায়ে শুকর

হযরত মৌলবী আব্দুল করীম সিয়ালকোটি সাহেব (রা.) কর্তৃক খুতবা অনুবাদ করার পূর্বে হুযূর আকদাস (আ.) অত্যন্ত দৃঢ় ও প্রাঞ্জল ভাষায় বলেন, "এই খুতবা গতকাল আরাফাতের দিনে এবং ঈদের রাত্রিতে আমি অনবরত আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে সকাতরে খোদার দরবারে যে দোয়া করেছিলাম সে সকল দোয়ার কবুলিয়্যত বা গৃহীত হওয়ার নিদর্শন ছিল কেননা শর্ত ছিল, যদি আমি ধারাবাহিকভাবে তৎক্ষণাৎ আরবী ভাষায় এই খুতবা প্রদান করতে পারি তাহলে এটা মেনে নেওয়া হবে যে, আমার সকল দোয়া কবুল হয়েছে। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র! আমার সমস্ত দোয়াই খোদা তা'লার ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুসারে কবুল হয়েছে।

(আল হাকাম, ১লা মে ১৯০০)

তখনো হযরত মওলানা আব্দুল করীম সাহেব তরজমা শুনাচ্ছিলেন হুযূর (আ.) উত্তেজনা ও উদ্দীপনার অধিক প্রাবল্যে 'সিজদায় শুকর'(কৃতজ্ঞতার সেজদা) দিলেন। উপস্থিত সকলেই তাঁর সাথে সাথে 'সিজদায়ে শুকর' আদায়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। সিজদাহ্ থেকে মাথা উঠানোর পর হযরত আকদাস (আ.) সবাইকে লক্ষ্য করে বলেন, "আমি এই মাত্র লাল কালিতে অংকিত 'মোবারক' শব্দটি দেখতে পেয়েছি যা আমার দোয়া কবুল হওয়ারই নিদর্শন বহন করে।

[মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯-৩০]

খুতবায়ে ইলহামিয়া এবং তত্ত্বজ্ঞানের মহাসমুদ্র

খুতবায়ে ইলহামিয়া হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কর্তৃক জগদ্বাসীর সামনে তাঁর সত্যতার এক উজ্জ্বল মাপকাঠি। যে ব্যক্তির আরবীতে কোন জ্ঞানই ছিল না, আরবী সাহিত্যের সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই তাঁর পক্ষে এরূপ একাধারে বক্তৃতা করা কিরূপে সম্ভব হতে পারে! কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা জগদ্বাসীর সামনে তাঁর প্রেরিত মসীহ্‌র সত্যতাকে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট করার জন্যই এ নিদর্শন দেখিয়েছেন। এটি এমন এক বক্তৃতা যার প্রতিটি অক্ষরে অক্ষরে 'হাকায়েক' ও 'মারেফাতের' সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞান রয়েছে, রয়েছে প্রজ্ঞার এক মহা সমুদ্র। হে

চিন্তাশীল চক্ষুস্মান ব্যক্তিবর্গ! আস এবং এ সমুদ্রে এক দক্ষ ডুবুরীর ন্যায় ডুব দিয়ে সহস্র বছর ধরে লুক্কায়িত মণিমুক্তা সংগ্রহ কর। অতি তাড়াতাড়ি এর দিকে ধাবিত হও। হে বুদ্ধিমান! যদি তুমি বিন্দুমাত্র জ্ঞানী হয়ে থাক ও তোমার বোধশক্তি যদি কট্টর না হয় আমার দিকে অগ্রসর হও কেননা 'এহী নূরে খোদা পাওগে' (কেবল এখানেই পাবে খোদার জ্যোতি)।

খুতবায়ে ইলহামিয়া সম্পর্কে কিছু কথা

১১ এপ্রিল ১৯০০ সনে ঈদ-উল আযহার দিন ঈদের নামাযের পর হতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) উপস্থিত সকলের সম্মুখে অত্যন্ত বাগ্মী ও সুদক্ষ বক্তার ন্যায় আরবী ভাষায় যে খুতবা প্রদান করেন তাই খুতবায়ে ইলহামিয়া নামে সুবিখ্যাত। এ খুতবা ইয়া ইবাদিল্লাহি ফাক্কির (হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা গভীরভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ করে চিন্তা কর) দিয়ে শুরু হয়েছে এবং ওয়া সাওফা ইউনাব্বিউহুম খাবির (এবং অচিরেই তাদেরকে সর্বজ্ঞানী খোদার পক্ষ থেকে অবগত করানো হবে) দিয়ে শেষ হয়েছে। এই খুতবায় কুরবানীর তাৎপর্য ও দর্শন অত্যন্ত সুনিপুন ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ খুতবা ইলহামিয়া সম্পর্কে হাকীকাতুল ওহী পুস্তকে লিখেন, '১৯ এপ্রিল ১৯০০ সালের ঈদ-উল আযহার দিন সকাল বেলায় আমার উপর ইলহাম হল, "আজ তুমি আরবীতে বক্তৃতা কর এ জন্য তোমাকে ঐশী শক্তি দেয়া হবে" সেই সাথে এটাও ইলহাম হল 'কালামুন উফসিহাত মিল্ লাদুন রাব্বিন কারিম' অর্থাৎ এই কথোপকথনে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে বাগ্মীতা ও বাকপটুতা দান করা হবে।

[হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, ২০তম খণ্ড, পৃ, ৩৬৬-৩৭৫]

এই কিতাবের মুখবন্ধে হুযূর (আ.) বলেন, এখানে উল্লেখিত জ্ঞান ও তত্ত্বকথা কোন পরিচিত বুযুর্গের কিতাব থেকে সন্নিবেশিত হয়নি বরং খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আমাকে ওহী করা হয়েছে। সেই অতুলনীয়, অসাধারণ তত্ত্বজ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি কি? হে খোদার বান্দারা! আজকের এই দিন যা বকরী ঈদ নামে প্রসিদ্ধ, একটু দৃষ্টি দাও ও চিন্তা কর এই কুরবানী করার মাঝে বুদ্ধিমানদের জন্য এক নিগূঢ় রহস্য গুপ্ত আছে। আপনারা জানেন এই দিনে অসংখ্য পশু কুরবানী করা হয়। কেউ উট কুরবানী করেন, কেউ গরু কুরবানী করেন, কেউবা আবার ছাগল-ভেড়া কুরবানী করেন আর এর সবগুলিই শুধুমাত্র খোদার সন্তুষ্টির বিধানকল্পেই করা হয়। বর্তমানে কুরবানী করার মাত্রা ও আধিক্য এতো বৃদ্ধি পেয়েছে যে, পশুদের রক্তে ভূপৃষ্ঠ আচ্ছাদিত হয়ে গেছে। এই সকল কাজ আমাদের ধর্মে সেই কাজগুলি অন্তর্ভুক্ত যা আমাদের আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভের পাত্র বানায়। এই কারণেই এই জবাইকৃত পশুদের নাম কুরবানী রাখা হয়েছে।

অতএব, আসল কথা হল জবাই এবং কুরবানী যা ইসলামে প্রচলিত একটি সাধারণ ব্যবস্থা কিন্তু এর আসল উদ্দেশ্য হল আত্মার কুরবানী। হৃদয়কে সকল প্রকার পঙ্কিলতা মুক্ত করাই এর মূল লক্ষ্য। কুরবানীর এই ব্যবস্থা এ কথাই বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়। আর এই মর্যাদা অর্জনে আমাদেরকে উৎসাহিত করে। এই বাস্তবতা যা পরিপূর্ণ আচরণের বদৌলতে সাধিত হয় তা এক করাতের ন্যায় যা হৃদয়কে চিরে টুকরো টুকরো করে এর মধ্য থেকে সকল প্রকার কলুষতা দূরীভূত করে হৃদয়কে পবিত্র করে তুলে। সুতরাং প্রত্যেক মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী যারা খোদার ভালবাসার আকাংখী ও অন্বেষী তাদের জন্য আবশ্যক এই বাস্তবতাকে উপলব্ধি করা এবং একে নিজের লক্ষ্য স্থল নির্ধারণ করা।

অতএব এই সুমহান মাকাম ও মর্যাদা থেকে গাফেল হয়ো না। জাগতিক চাকচিক্য ব্যস্ত দলের সঙ্গী হয়ো না এবং এরই রহস্য থেকেও উদাসীন থেকো না যা কুরবানী করার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। কুরবানীর এই প্রকৃত তত্ত্বকে দেখার জন্য এই সত্যতাকে আয়নার মত বানাও যেন এর মাঝে ত্যাগ আত্ম উৎসর্গের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায়। সেই সকল লোকের ন্যায় আত্মবিস্মৃত হয়ো না যারা স্বয়ং খোদা ও নিজেদের কিয়ামত সদৃশ মৃত্যুকে ভুলে বসেছে। পরিতাপ! মানুষ এই রত্নখচিত তত্ত্বজ্ঞানকে ভুলে গেছে। তাদের নিকট ঈদ অর্থ হল গোসল করে নতুন কাপড় পরিধান করা, সুস্বাদু ও উন্নত খাবার, আড্ডা ও খেলাধূলায় ব্যস্ত থাকা এবং মুরগীর মত নামাযের মধ্যে ঠোকর মারা। তারা জানে না কি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে গরু ছাগল ইত্যাদি জবাই করা হয়। আমরা ধর্মীয় দুর্বিপাকে আবর্তিত ও দৈনন্দিন সমস্যায় আক্রান্ত হওয়ার পর কেবল ইন্না লিল্লাহ্ পড়ছি। অথচ আমাদের কোন সঠিক পথ প্রদর্শনকারী নেই। যার ফলে আমরা দিকভ্রান্ত হয়ে ছুটাছুটি করছি। আমাদের অন্ধকারে নিমজ্জিত এই তিমির রাত্রি দেখে খোদার অনুকম্পা আমাদের প্রতি বৃদ্ধি পেল। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যেন আকাশ থেকে কোন নূর অবতীর্ণ হয় যা সকলকে আলোকিত করবে। সর্ব ধর্ম, দেশ ও জাতিকে এক সূতায় নিয়ে অন্তরে অবতীর্ণ হোক, আমিই হলাম সেই বহু কাঙ্খিত নূর, যামানার মোজাদ্দেদ, মাহদী মাওউদ এবং মসীহ্ মাওউদ। তোমরা আমার ব্যাপারে কোন সন্দেহে নিপতিত হয়ো না।

আমি এইজন্যই এসেছি যেন আমার খোদা আমার মাধ্যমে আপন মহাশক্তির ও সৌন্দর্যের বৈশিষ্ট্য ধরিত্রীবাসীকে দেখাতে পারেন। যুগ এক ন্যায় বিচারক মীমাংসাকারীর মুখাপেক্ষী এবং এক প্রকৃত কল্যাণকামীর প্রত্যাশী ছিল। তাই খোদা আমাকে প্রেরণ করেছেন যেন আমি সঠিক মীমাংসা ও কল্যাণের স্রোতধারাকে আরো বৃদ্ধি করতে পারি। অতএব, শুনে নাও! আমি দু'টি রঙের পোষাক পরিধান করে আগমন করেছি অর্থাৎ একটি হল প্রতাপ ও শক্তির পোষাক এবং অন্যটি হল শোভা ও সৌন্দর্যের পোষাক। প্রতাপ ও শক্তির পোষাক আমাকে এই জন্য দেওয়া হয়েছে যেন আমি শির্ককে নি:শেষ করে দিই আর সৌন্দর্য ও শোভার পোষাক এই জন্য দেওয়া হয়েছে যেন সকলকে প্রেম, প্রীতি, ভালবাসার মাধ্যমে তৌহীদের পতাকাতলে সমবেত করি। আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যেন আমি শূকরকে (মন্দ স্বভাব বিশিষ্ট আত্মা) হত্যা করি। এই হত্যা ঐশী অস্ত্রের মাধ্যমে সংঘটিত হবে কোন বাহ্যিক তীর তলোয়ারের মাধ্যমে নয়। এরূপভাবে আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যেন আমি মু'মিনদের ঘরকে ধন-ভান্ডারে ভরপুর করে দিই কিন্তু এই ধন-ভান্ডার জাগতিক কোন স্বর্ণ-রৌপ্য নয় বরং জ্ঞান-প্রজ্ঞা এবং এই ধন-ভান্ডার হল সঠিক দিক নির্দেশনার।

খুতবায়ে ইলহামিয়া মুখস্ত করার তাহরীক

এই খুতবা যেহেতু এক জবরদস্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞাগত নিদর্শন ছিল এই জন্য এর গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর খোদ্দামদেরকে এটি মুখস্ত করার তাহরীক করেন। হুযূরের এই তাহরীকে সাড়া দিয়ে তাঁর একনিষ্ঠ খাদেম হযরত সুফী গোলাম মুহাম্মদ সাহেব, হযরত মীর মুহাম্মদ ইসমাইল সাহেব, হযরত মুফতী মোহাম্মদ সাদেক সাহেব, মৌলবী মুহাম্মদ আলী সাহেব ছাড়া আরো কয়েকজন বন্ধু খুতবা মুখস্ত করে ফেলেন। এমনকি শেষের দু'জন ঈদের দিনেই মসজিদে মোবারকের ছাদে মাগরিব ও এশার নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সকলের সামনে এই খুতবা মুখস্ত শুনান। হযরত মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব সাহিত্যের প্রতি গভীর আগ্রহ রাখতেন। তিনি এই খুতবার প্রেমে এতই মগ্ন হয়ে পড়লেন যে, অধিকাংশ সময় তা সর্বসাধারণকে শুনিয়ে বেড়াতেন এবং কিছু কিছু ইবারতের উপর তিনি এতই প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন যে সেগুলি তার ঠোটে সর্বদা উচ্চারিত হতো। ছোট-ছোট শিশু যাদের বয়স বার বছরের উর্ধ্বে ছিল না তারাও এই খুতবা মুখস্ত করে ফেলে এবং কাদিয়ানের অলিতে-গলিতে আবৃত্তি করতে থাকে। (তারিখে আহমদীয়াত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৪)

আল্লাহ্ তা'লা তার প্রেরীত মাহদীর সত্যতাকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরতে তাঁর বিরুদ্ধে আপত্তিকারী সকল বিরুদ্ধবাদীর মুখকে স্তব্ধ করে দিতে সেই সাথে 'তিনি আরবী জানেন না' নামক আরোপিত আপত্তির দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়ার মানসে স্বয়ং খোদা জগদ্বাসীকে এক বিস্ময়কর ঐশী নিদর্শন দেখিয়েছেন। এটা ঐশী নিদর্শনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বৈ আর কিছু নয়। যখন খোদা কোন বান্দার হয়ে যান তখন তিনি তার সাহায্যের জন্য নতুন এক খোদা হয়ে যান। জগৎ তাঁর অকৃত্রিম সাহায্য-সহযোগিতার নিদর্শন অবলোকন করে। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন-

"খোদাকে পাক লোগোঁ কো খোদা নুসরত আতি হ্যাঁজাব আতি হ্যা তো যেহ্র আলাম কো এক আলম দেখাতি হ্যা"

অর্থাৎ, খোদার পবিত্র বান্দাদের জন্য খোদা তা'লার পক্ষ থেকে সাহায্য এসে থাকে।

যখন এই সাহায্যের স্রোতধারা আসতে থাকে তখন জগত এক নতুন জগতকে অবলোকন করে।"

তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় এটি ছিল সেই নুসরতে ইলাহী বা ঐশী সাহায্য। প্রতিশ্রুত মসীহের সেই দলীলে আফতাব (দিবাকরের ন্যায় সুস্পষ্ট প্রমাণ) যার পানে তিনি সকলকে আহ্বান করেছেন।

'খুতবায়ে ইলহামিয়া জগতের সামনে আগত মসীহকে নতুনরূপে তুলে ধরেছে, সকলের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের ভিতকে আরো দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সর্বোপরি যদি আমরা সমগ্র মানবজাতির হেদায়াতকল্পে এই মূল বিষয়বস্তু "আত্মার কুরবানী" অর্জন করার দিকে, সবিশেষ দৃষ্টি দিই আর যদি এই রূহানী মর্যাদা ও পবিত্র পরিবর্তন আমাদের মাঝে সাধন করি তাহলেই আমরা সকলে ঐশী খোদার উজ্জ্বল নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত হব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে খুতবায়ে ইলহামিয়ার গুরুত্ব এবং এর প্রবহমান কল্যাণধারা থেকে কল্যাণমন্ডিত হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন, আমীন।

[মাসিক আনসারুল্লাহ্, এপ্রিল, ২০১০ অবলম্বনে]

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-9 Thursday, 15 Aug, 2024 Issue No.33

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

দাবি করছে যে, তাকে মানুষকে সতর্ক করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ কিছু পুরোনো কথা ত্যাগ করে কিছু নতুন বিষয় অবলম্বন কর। এমন মানুষদের জন্য সব সময় একথা বিস্ময়ের হয়ে থাকে যে, রসূল বলছে বর্তমান ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে নতুন ব্যবস্থাপনা অবলম্বন কর। কাফেরদের এই দুটি কথার মধ্যে স্ববিরোধ রয়েছে। একদিকে তো তাদের মধ্যে এতটা হতাশা রয়েছে যে, তারা মনে করে, তাদের চিকিৎসার জন্য তাদের মধ্য থেকে কেউ আসতে পারেনা। অপরদিকে তারা এনিয়ে লড়াই করে যে, তাদের ব্যবস্থাপনা কেন বদলে দিচ্ছ? অধঃপতিত জাতির এমনই দশা হয়ে থাকে। তারা চায় যেন কিছু ত্যাগ করতে হয় আর না কিছু কাজ করতে হয়। এক ব্যক্তি বাইরে থেকে এসে তাদের বর্তমান ব্যবস্থাপনা বজায় রেখে তাদেরকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাবে। এরজন্য তাদেরকে শিক্ষা অর্জনও করতে হবে না, পরিশ্রমও করতে হবে না কিম্বা কোনও মন্দ কর্ম ত্যাগ করতে হবে না। বরং এক ব্যক্তি বাইরে থেকে এসে অন্যদেরকে মেরে ফেলবে আর সব কিছু তাদের হয়ে যাবে। তারা চিন্তা করে দেখে না যে, যদি পূর্বের ব্যবস্থাপনা সঠিক থাকত, তবে লাঞ্ছনা ও পশ্চাদপদতায় কেনই বা পড়ে থাকত? অতএব তাদের বর্তমান ব্যবস্থাপনা ভেঙ্গে দিয়েই পরিবর্তন সম্ভব।

"আমল দুই প্রকারের। এক, সেই আমল যা মানুষকে পুরস্কারের যোগ্য করে তোলে, আর দ্বিতীয় প্রকারের আমল সেটি যা পুরস্কার লাভের পর সেটিকে বজায় রাখার জন্য আবশ্যক হয়ে থাকে। অনেক ছাত্র ছাত্রজীবনে বেশ মেধাবী হয়ে থাকে, কিন্তু তারা যখন জীবন যুদ্ধের মধ্যে পড়ে, তখন একেবারেই অপদার্থ হিসেবে প্রতিপন্ন হয়। অনুরূপ অবস্থা যে কোনও জাতিসত্তার। কিছু জাতি বৈভব ও খ্যাতি লাভের পূর্বে খুব ভাল দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে, কিন্তু ক্ষমতা লাভের পর পুণ্যের মান বজায় রাখা তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়ত এই বাক্যটির সম্প্রসারণ করার আরও একটি কারণ হল, মানুষের কর্ম দুই প্রকারের হয়ে থাকে। এক, পুণ্যকর্ম এবং দ্বিতীয় সেই কর্ম যা উক্ত পুণ্যকর্মকে প্রতিষ্ঠিত রাখে। কাজেই এই বাক্য সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য হল তোমাদের ব্যক্তিগত পুণ্যের কারণে আমরা তোমাকে 'খোলাফাউ ফিল আরজ' করেছিলাম। এর পর আমরা দেখতে চাইছিলাম যে, তোমরা এই কর্মধারাকে কিভাবে বজায় রাখ, যা তোমাদের পুণ্যের রক্ষক হয়। সত্য

বি আইমানিহিম বলার মাধ্যমে এ বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কর্মের প্রতিদান ঈমান অনুসারে দেওয়া হবে। অর্থাৎ বাহ্যিক আমলের ক্ষেত্রে যদিও দুজন ব্যক্তি সমান হয়, কিন্তু আমল বা কর্মের পিছনে যে নিষ্ঠা ও ভালবাসা রয়েছে, তার উপর ভিত্তি করে তাদের কর্মের প্রতিদানে তারতম্য ঘটবে। এটিও একটি অসাধারণ বিষয়। আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, আবু বাকার তোমাদের থেকে সেই কারণে শ্রেষ্ঠ যা তাঁর অন্তরে রয়েছে। আমরা দেখি যে এক ব্যক্তি নামায বেশি পড়ে, রোযাও বেশি রাখে, কিন্তু অন্য কোনও ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার কৃপাকে বেশি পরিমাণে আকর্ষণ করে। এর কারণ তাদের অন্তরের অবস্থা। যে বেশি প্রকৃত পবিত্রতা ও নিষ্ঠা অর্জন করে, তার অল্প কর্ম বেশি কল্যাণ বয়ে আনে। বস্তুত সেই ব্যক্তির সমস্ত কর্মই ইবাদতে পরিণত হয়। কেননা, তার সেই সব কর্মও খোদার জন্যই হয়ে থাকে, যেগুলিকে আপাত দৃষ্টিতে জাগতিক কর্ম বলে মনে হয়, আর তার প্রতিটি গতিবিধি মানব জাতির সহানুভূতির কারণ হয়।

(তফসীর কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৪)

এই যে পুণ্যকর্মের থেকে অনেক বেশি কঠিন হল সেই পুণ্যকে প্রতিষ্ঠিত রাখার কাজ। জাতির ধ্বংসের কারণই হল তারা উন্নতির চেষ্টা করে ঠিকই, কিন্তু সেটিকে বজায় রাখার চেষ্টা করে না। নিজের তাকওয়ার প্রতি যত্নবান থাকে, কিন্তু সন্তানের নৈতিকতার প্রতি তাদের দৃষ্টি থাকে না। পরিণামে তাদের পুণ্যের মান হ্রাস পেতে থাকে, অবশেষে তা কেবল আক্ষরিক অর্থে অবশিষ্ট থাকে, যা থেকে সত্য হারিয়ে যায়। আর এই পরিবর্তন যেহেতু কয়েক প্রজন্ম ধরে হয়, তাই তা অনুভবও করা যায় না এবং পরিশেষে জাতি ধ্বংসের গহ্বরে নিপতিত হয়। তাই এই বাক্যে এবিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, দেখার বিষয় হল এখন তোমরা নিজেদের খিলাফতকে কতদিন পর্যন্ত টিকিয়ে রাখতে পার।

মুসলমান জাতি যদি এই অনন্য বিষয়টির প্রতি যত্নবান থাকত, তবে আজ তাদের এই দশা হত না। একসময় তারা নিজেদের সন্তানদের তরবীয়তের কর্তব্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে আর তাদের অবৈধ ভালবাসা তাদের উপর প্রভুত্ব করেছে কিম্বা তারা বিয়ে শাদির বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করে নি আর এমন সব মেয়েদেরকে পরিবারে নিয়ে এসেছে যারা ইসলামী তরবীয়তের যোগ্য ছিল না আর রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবাগণের হাতে যে আযীমুশশান ইমারত তৈরী হয়েছিল, তা ভূপতিত হয়েছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। যে জাতিকে আল্লাহ্ তা'লা ইসলামের উন্নতির জন্য মনোনীত করেছেন, তারা যদি ভবিষ্যতে এবিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়, তবে ইনশাআল্লাহ্ পৃথিবীতে এক অসাধারণ পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। রসূলুল্লাহ (সা.) এই কর্তব্যের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন- 'কুল্লুকুম রাইন ওয়া কুল্লুকুম মাসউলুন আর রাইহি'। অর্থাৎ তোমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের ব্যক্তিগত দায়িত্বাবলী ছাড়াও কিছু অন্যান্য সত্তার বিষয়েও দায়বদ্ধ। আল্লাহ্ তা'লা কেবল এই প্রশ্ন করবেন না যে তুমি কি আমল করেছ, বরং তিনিও এও জিজ্ঞাসা করবেন যে, তোমাকে যাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তাদেরকে তোমরা কতটা যোগ্য করে তুলেছ? কাজেই কেবল নিজের পবিত্রতা মানুষের কোন কাজে আসতে পারে না।

(তফসীর কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪১-৪২)

নিজের ইচ্ছেয় পরছেন।

হুযুর আনোয়ার আরও বলেন, এ বিষয়ে কোন যুক্তি প্রমাণ দাঁড় করানোর প্রয়োজন নেই। যারা আপনার চলাফেরা নিয়ে সন্দেহ করে, আপনি তার সঙ্গে লড়াই তো আর করতে পারেন না। মানুষের সঙ্গে লড়াই করা আমাদের কাজ নয়। আপনি তাদেরকে বলে দিয়েছেন, এখন তারা মানুক বা না মানুক তাতে কিছু যায় আসে না। অন্যান্য মেয়েরা আপনাকে জ্বালাতন করে বলে মোটেই হীনমন্যতার শিকার হবেন না। তারা চাইলে আপনাকে জ্বালাতন করতে পারে। আমরা যদি খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজেদের ধর্মের শিক্ষামালা অনুশীলন করি, তবে লোকে কি ভাববে তা নিয়ে আমাদের মোটেই চিন্তিত হওয়া উচিত নয়।

প্রশ্ন: কিভাবে আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা ও যুগ খলীফার ভালবাসা লাভ করা যায়?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা অর্জনের জন্য তিনি তাঁর ইবাদত করার এবং তাঁর নৈকট্য অন্বেষণের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার উপদেশ দিয়েছেন এবং নামাযে অবিচলতা ও কান্নাকাটি করার উপদেশ দিয়েছেন। এর পরেই আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে স্বীয় নৈকট্য দান করেন। তখন তিনি তোমাদের দোয়া কবুল করবেন আর যখন আপনাদের হৃদয় প্রশান্তি লাভ করবে তখন অনুভব করবেন যে, আপনি খোদার নৈকট্য লাভ করেছেন। খোদার নৈকট্য লাভ হলে তখন তিনিই আপনাকে আরও বেশি নৈকট্য লাভের উদ্ধুদ্ধ হবেন যাঁর সঙ্গে আপনি বয়আতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন এবং তাঁর কথাগুলি মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এবং সেগুলির উপর আমল করবেন। যুগ খলীফা আপনাদেরকে পুণ্যের আদেশ দেয় আর আপনারা যখন এমনটি করেন তখন আপনারা খোদার নৈকট্য লাভ করেন। আর এই পুণ্যকর্মগুলিই আপনাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারীতে পরিণত করবে। যখন আপনারা ভাল কাজ করেন এবং আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করেন তিনি যেন আপনাদেরকে নৈকট্য দান করেন, তখন খোদা তা'লা আপনাদের মনে প্রশান্তিও সৃষ্টি করেন।

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা একথা ভুলে যেও না যে, খোদা তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহ ব্যতিরেকে তোমরা আদৌ জীবিত থাকতে পার না।

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir